(কলিকাতা গেজেট, ১৮ই জুন, ১৯৪২)

কাঞ্চনজঙ্ঘা-সিরিজের প্রথম গ্রন্থ

অন্ধকারের বন্ধু

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দেব সাহিত্য কুটীর

দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

পুনর্মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৪৯

দাম—আট আনা

প্রিণ্টার—এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

ছোট্ট বন্ধু

শ্রীমান সত্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে

এই ছোট্ট বইখানি

উপহার

দিলুম

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

......হাত বাড়াতেই সতীশবাবু তাঁর হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিচয়

হেমন্ত চৌধুরীকে আমি ছেলেবেলা থেকেই অসাধারণ মানুষ ব'লে মনে ক'রে আসছি।

পাঠশালা থেকে ইস্কুলে, ইস্কুল থেকে কলেজে আমরা দুজনে বরাবরই একসঙ্গে শিখেছি লেখাপড়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ধাপ পর্য্যন্ত ওঠবার পরেও জীবনের যাত্রাপথে আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়নি—সাধারণত যা হয়ে থাকে। তার কারণ আমরা দুজনেই ছিলুম স্বাধীন।

আরো নানান্ দিকেই আমাদের দুজনের মধ্যে আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। আমরা দুজনেই ধনীর সন্তান এবং দুজনেই শৈশবে বাপ-মাকে হারিয়েছি। দেহচর্চ্চার দিকে আমাদের দুজনেরই একান্ত ঝোঁক—কুস্তি, যুযুৎসু, 'বক্সিং' (সঙ্গে সঙ্গে লাঠি-তরোয়াল খেলা) কিছুই শিখতে বাকি রাখিনি—যদিও প্রতিযোগিতায় বরাবরই হেমন্ত হয়েছে প্রথম এবং আমি হয়েছি দ্বিতীয়। আমরা দুজনেই দেশে দেশে বেড়াতে ভালোবাসি এবং এই যৌবনেই য়ুরোপ-আমেরিকা পর্য্যন্ত ঘুরে এসেছি। আমরা দুজনেই বিবাহ করিনি এবং ঘটকরা বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ালেই ঘুসি পাকিয়ে তেড়ে যাই।

কিন্তু আমাদের দুজনের দিন ও সময় কাটাবার উপায় একরকম নয়। কারণ হেমন্ত করে সখের গোয়েন্দাগিরি, আর আমি করি সখের সাহিত্য-সাধনা।

আমার সাহিত্য-সাধনার কথা নিয়ে এখানে কিছু বলবার দরকার নেই। আমি আজ কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি অন্য কারণে।

গোয়েন্দাগিরিতে আজকাল হেমন্ত এমন সুনাম কিনেছে যে, আমার মুখ থেকে নানা লোকে তার কাহিনী শোনবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ ক'রে থাকে। এজন্যে হেমন্তেরও কাছে অনেকে ধর্ণা দিতে ছাড়েন না। কিন্তু একদিক দিয়ে সে হচ্ছে বেজায় লাজুক—নিজের বাহাদুরির কথা নিজের মুখে জাহির করতে রাজি হয় না কিছুতেই। তখন সবাই আমাকে

নিয়েই টানাটানি করেন এবং আমাকেও নিরুপায় হয়ে তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে হয়। কিন্তু বারে বারে নানা জনের কাছে মুখে মুখে হেমন্তের কত গল্প আর বলব? তাই এবারে স্থির করেছি, লোকের আগ্রহ নিবারণের জন্যে হেমন্তের কীর্ত্তিকাহিনী ছাপার হরপে প্রকাশ করব একে একে।

আমি সুরু করব একেবারে গোড়া থেকেই। অর্থাৎ হেমন্ত সর্ব্বপ্রথমে যে-মামলার কিনারা ক'রে দেশ-বিদেশে যশস্বী হয়ে ওঠে, আগে তার কথাই লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতে চাই। কিন্তু তারও আগে হেমন্তের আরো কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার মনে করি।

ম্যাজিকের আমগাছ দর্শকদের চোখের সামনে গজিয়ে ওঠে হঠাৎ। কিন্তু হেমন্ত অকস্মাৎ পুরোদস্তুর গোয়েন্দা হয়ে পড়েনি, এজন্য তাকে সাধনা করতে হয়েছে দস্তুরমত।

ছেলেবেলা থেকেই কাল্পনিক গোয়েন্দা-কাহিনী পড়বার জন্যে তার অতিশয় ঝোঁক ছিল এবং আজ পর্য্যন্ত সে পাঠ করেনি পৃথিবীতে এমন বিখ্যাত গোয়েন্দার গল্প বোধ হয় নেই। কিন্তু এই সব কাল্পনিক এবং প্রায়ই অতি-উদ্ভট কাহিনী প'ড়ে কোনদিনই সে বিশেষজ্ঞ হবার চেষ্টা করেনি!

সে য়ুরোপে-আমেরিকায় গিয়েছিল প্রধানত এক উদ্দেশ্য নিয়ে! পাশ্চাত্য দেশের সত্যিকার গোয়েন্দারা কোন্ কোন্ পদ্ধতি অনুসারে কাজ করে, সে গিয়েছিল হাতে-কলমে তাই শেখবার জন্যেই। এদেশের পুলিস-বিভাগের কয়েকজন উচ্চতম

কর্ম্মচারীর কাছ থেকে সে খানকয় সুপারিস-পত্র জোগাড় ক'রেছিল, তারই সাহায্যে গোয়েন্দা-বিভাগের ভিতর থেকে পাশ্চাত্য-পুলিসদের কাজ দেখবার সুযোগ তার হয়েছিল।

য়ুরোপের দেশে দেশে গোয়েন্দা-পুলিসদের কার্য্যপদ্ধতি আছে নানারকম। তারই মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মান ও অষ্ট্রিয়ান পুলিসের পদ্ধতি। হেমন্ত এই চার-রকম পদ্ধতি নিয়েই বিশেষ ভাবে আলোচনা করবার অবসর পেয়েছে।

সেকালকার পুলিসরা কাজ করত অনেকটা অন্ধের মত। বিজ্ঞান ছিল তখন শিশু এবং বিজ্ঞান যেটুকু জানত, পুলিস সেটুকু সাহায্যও গ্রহণ করা দরকার মনে করত না। বার্টিলনের মাপ নেবার বা আঙুলের ছাপ নেবার পদ্ধতি তখন আবিষ্কৃত হয়নি। ক্যামেরা, মাইক্রোসস্কোপ ও রসায়ন শাস্ত্রের কাছ থেকেও পুলিসের কিছু লভ্য ছিল না। রক্তের মত কোন দাগ দেখলেই পুলিস তাকে গ্রহণ করত রক্ত ব'লেই ; তা রক্ত কিনা এবং রক্ত হ'লেও তা মানুষের বা পশুর রক্ত কিনা কিংবা তা বিশেষ কোন মানুষের রক্ত কিনা, এ-সব জানবার কোন উপায়ই ছিল না। কিন্তু একালের উন্নত বিজ্ঞান এসে পুলিসের অন্ধতা অনেকটা দূর ক'রে দিয়েছে।

এই বিজ্ঞানের দিক দিয়ে হেমন্ত ছিল যথেষ্ট অগ্রসর। সে বিজ্ঞানে সর্ব্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে এম্-এ পাস করেছিল। এবং এখনো নিয়মিত ভাবেই বিজ্ঞান-চর্চ্চা করে। গোয়েন্দা-

রিতে বিজ্ঞানকে সে এমন কৌশলে কাজে লাগাতে পারে যে, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আজ আমি যে-কাহিনীটি বলতে বসেছি, পাঠকরা তার মধ্যেও হেমন্তের বৈজ্ঞানিক তীক্ষ্ণবুদ্ধির খানিকটা পরিচয় লাভ করবেন।

বাংলাদেশের অপরাধীদের সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহের জন্যে সে এখানকার পুলিসের বড় হোমরা-চোমরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছে। যদিও কোন দেশেরই পুলিস বাইরের সখের গোয়েন্দাদের বিশেষ খুসির চোখে দেখে না, বরং তাদের মনে করে অকেজো উড়ো আপদের মত। কিন্তু কলকাতা পুলিসের কোন কোন কর্ম্মচারীর ব্যবহার দেখলে বেশ বোঝা যায়, হেমন্তের মতামতের উপরে তাদের শ্রদ্ধার অভাব নেই।

এর কয়েকটি কারণও আছে। প্রথমত, হেমন্ত না ভেবে-চিন্তে যুক্তিহীন কোন কথাই বলে না। দ্বিতীয়ত, তার বক্তব্য সে অতি বিনীত ভাবে প্রকাশ করে। পুলিসের লোকের সঙ্গে তার কথাবার্ত্তা শুনলে মনে হয়, গুরুর সামনে ছাত্র যেন নিজের মতামত নিবেদন করছে। কাজেই তার কাছে সাহায্য চাইতে এলেও পুলিসের অহমিকা বা হামবড়াই ভাব আহত হয় না।

হেমন্ত খালি পুলিসের সঙ্গেই মেলামেশা করে না। এদেশের চোর, গাঁটকাটা, গুণ্ডা, খুনী ও দাগী পুরাতন পাপীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যে তার আগ্রহ এত বেশী যে, মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়, কোন্‌দিন সে হয়তো সাংঘাতিক বিপদে

পড়বে! মুসলমানের ছদ্মবেশ প'রে প্রায়ই সে মেছোবাজারের ও সহরের অন্যান্য কু-বিখ্যাত পাড়ার বস্তী এবং কফিখানায় ঢুকে অনেক রাত পর্য্যন্ত কাটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে আমাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়। ফলে এমন অনেক বদমাইসের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে, যাদের রাস্তায় আনাচে-কানাচে দেখলে ভদ্রলোকদের বুক ভয়ে না কেঁপে পারে না!

আমি যদি বলি, "হেমন্ত, ওদের সঙ্গে মিশ্‌তে তোমার ঘৃণা হয় না?"

হেমন্ত হেসে বলে, "না ভাই রবীন, মোটেই নয়। ডাক্তাররা ঘৃণা-ভরা মন নিয়ে যক্ষ্মা আর কুষ্ঠ প্রভৃতি কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের কাছে যান না। আমিও হচ্ছি আর-এক শ্রেণীর ডাক্তারের মত, আর অপরাধীদের মনে করি রোগীদের মত। সাধারণ রোগীদের দেহ হয় ব্যাধিগ্রস্ত, আর এ ব্যাধি আক্রমণ করে অপরাধীর দেহকে নয়, মনকে। চুরি জুয়াচুরি খুন ডাকাতি মানসিক ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয়। ও-সব ব্যাধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হ'লে অপরাধীদের সঙ্গে ভাব না করলে চলে না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাজাহানের পাঞ্জা

হেমন্তের বাড়ীর একতালায় পাশাপাশি দুখানি হল-ঘর ছিল। তার একখানি হচ্ছে পরীক্ষাগার। সেখানে আছে একটি সুদীর্ঘ টেবিলের উপরে নানারকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং দেওয়ালের তাকে তাকে সাজানো হরেকরকম তরল ও চূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ-ভরা কাঁচের জার, শিশি ও বোতল।

আর-একখানি ঘর হচ্ছে একসঙ্গে তার বৈঠকখানা ও লাইব্রেরী। তার চারিদিকের দেওয়াল ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে বড়-ছোট, রোগা-মোটা কেতাবে ভরা আলমারি এবং মাঝখানে ধব্‌ধবে চাদর-বিছানো নরম বিছানা-ভরা চৌকি, চেয়ার, সোফা, কৌচ্‌ ও ছোট ছোট টেবিল প্রভৃতি।

সেদিন বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি, কৌচে ব'সে হেমন্ত কোলে পাতা একখানা বইয়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বললুম, "কি হে ভায়া, অত মন দিয়ে কি বই পড়া হচ্ছে?"

হেমন্ত মুখ তুলে বললে, "বই পড়ছি না ভাই, ছবি দেখছি! এখানা হচ্ছে ক্যালকাটা পুলিস জার্নাল।"

—"পুলিস জার্নালের ছবি? তাহ'লে নিশ্চয় তোমার কোন স্যাঙাতের—অর্থাৎ চোর কি খুনীর চেহারা?"

—"না রবীন, তোমার রসিকতা মাঠেই মারা গেল। এ ছবি দেখে আমি এক পৃথিবীবিখ্যাত অমর শিল্পীর কথা ভাবছি।"

—"কি সর্ব্বনাশ, পুলিসের শনির দৃষ্টি আজকাল কি শিল্পীদেরও ওপরে গিয়ে পড়েছে?"

—"রবীন, পুলিসের ওপরে অকারণে তুমি এতটা নির্দ্দয় হোয়োনা। আর পুলিসের দৃষ্টি শিল্পীদের ওপরে পড়বেই বা না কেন শুনি? শিল্পী মানেই কি সাধু? ফ্রান্সের বিখ্যাত কবি ভিলন কি চোর আর খুনী ছিলেন না? ইতালীর সিজিস্‌মোন্দো মালাতেসার নাম শুনেছ?"

—"না। কে তিনি?"

—"কবি, পণ্ডিত, ললিতকলার উপাসক। মধ্য-যুগে তার জন্ম। কিন্তু তার মত দুর্নীতিপরায়ণ ক্রিমিনাল তুমি কলকাতার কোন কফিখানা বা বস্তী খুঁজলেও পাবে না। ও-সব কথা যাক্! আমি এখন কি দেখছি জানো? তাজমহলের স্রষ্টা সাজাহান বাদসার পাঞ্জা।"

—"দেখি।" বইখানি হাতে নিয়ে দেখলুম, একখানি ছবিতে ছাপা সম্রাট সাজাহানের ডানহাতের ছাপ।

হেমন্ত বললে, "সেকালে মোগল-সাম্রাজ্যের সমস্ত মূল্যবান কাজ-পত্রের ওপরে সম্রাটের পাঞ্জার ছাপ থাকত। কারণ মোগলরা জানত, শীলমোহর বা হাতের সই জাল হ'তে পারে, কিন্তু পাঁচ-আঙুল-সুদ্ধ করতল বা পাঞ্জার ছাপ জাল হওয়া অসম্ভব। পৃথিবীর কোন দুজন মানুষের পাঞ্জার ছাপ এক-রকম হ'তে পারে না। বাংলা পুলিসের স্যর উইলিয়ম হার্সেল সাহেব পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে আসামীদের আঙুলের ছাপ নেবার পদ্ধতি গ্রহণ করেন এই সেদিন—১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে। আজ এই পদ্ধতির আদর পৃথিবীর দেশে দেশে। কিন্তু ভারতে এই পদ্ধতির জন্ম বহুকাল আগে। কেবল মোগলদের পাঞ্জার ছাপ নয়, হিন্দুরাও প্রাচীন কাল থেকে দলিলের উপরে নাম-সইয়ের বদলে আঙুলের টিপ-সই ক'রে আসছে। সুতরাং আধুনিক পুলিসের আবিষ্কারের ভেতরে কোনই বাহাদুরি নেই।...

...কিন্তু রবীন, সাজাহান বাদসার পাঞ্জার ছাপ দেখে তোমার কিছু মনে হচ্ছে না?"

—"হচ্ছে বৈকি! মনে হচ্ছে, এ হাতের ছাপ দেখলে সাজাহানকে স্মরণ হয় না!"

—"ঠিক বলেছ। দিল্লী-আগ্রার নানা প্রাসাদে, মসজিদে, স্মৃতি-সৌধের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালে যে শিল্পী সাজাহানের সৌন্দর্য্য-প্রীতি দেখলে অভিভূত হয়ে যেতে হয়, এই কি তাঁর নিজের হাতের ছাপ? আধুনিক বিশেষজ্ঞরা বলেন, মানুষের

আঙুলের গড়ন দেখলে তার প্রকৃতি আর পেশা বোঝা যায়। কিন্তু সাজাহানের আঙুলের গড়ন দেখ! শিল্পীর আঙুলের গড়ন এ-রকম হওয়া উচিত নয়—যে কোন সাধারণ লোকের হাতের ছাপ এ-রকম হ'তে পারে। ব'সে ব'সে এই কথাই ভাবছিলুম।"

পুলিস জার্নালখানা রেখে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আমি বললুম, "ভাই, উত্তরদিকের জান্‌লা দুটো বন্ধ ক'রে দি। এই দুর্জ্জয় শীতের ওপরে কাল আবার বৃষ্টি হয়ে ঠাণ্ডা আরো বেড়ে উঠেছে। চট্ ক'রে এক পেয়ালা চায়ের হুকুম দাও।"

কৌচের উপরে পাদুটো লম্বা ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে হেমন্ত বললে, "তা যেন দিচ্ছি! কিন্তু দুর্জ্জয় শীতকে যদি এতই ভয়, তবে আজ তুমি গঙ্গাপার হয়ে বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলে কেন?"

চমৎকৃত হয়ে বললুম, "এ কথা তুমি কেমন ক'রে জানলে? কেউ বলেছে বুঝি?"

—"তুমি তো সিধে ওপার থেকে এপারে নেমেই ধূলো-পায়ে আমার বাড়ীতে আসছ! এর মধ্যে খবর আর কে দেবে? কেমন, যা বলছি সত্যি কিনা?"

—"হ্যাঁ ভাই, সত্যি। কিন্তু আমি কোন বাগানে বেড়াতে যাইনি! তুমি তো জানো, বেলুড়ে আমার ভগ্নীপতি থাকেন? তাঁর অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলুম। তবে তাঁর বাড়ীর সামনে একটা বেশ বড় বাগান আছে বটে! কিন্তু

এ-সব কথা তোমার তো জানবার নয়, তুমি তো কখনো সেখানে যাওনি!”

—“না, তা যাইনি। কিন্তু তুমি তো এ-কথা জানো বন্ধু, সর্ব্বদা আমার চোখ খোলা রাখি ব'লে কোথাও না গিয়েও আমি অনেক কথাই বলতে পারি।”

আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগলুম, কোন্ সূত্র ধ'রে হেমন্ত আমার সম্বন্ধে এত কথা জানতে পারলে? নিজের জামার বোতাম-ঘরে যে ‘কার্নেশান্’ ফুলটি গুঁজে রেখেছিলুম হঠাৎ সেইদিকে আমার নজর পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝলুম হেমন্তের আবিষ্কারের মূল আছে এই ফুলটিতেই।

হেমন্ত অর্দ্ধ-মুদিত চোখে আমার ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করছিল। হাসতে হাসতে যেন অন্তর্যামীর মতই বললে, “না, বন্ধু, না! তুমি যা ভাবছ তা নয়! জামার বোতাম-ঘরের ঐ ফুলটি তুমি কলকাতার কোন বন্ধুর বাড়ী বা ফুলের দোকান থেকেও সংগ্রহ করতে পারতে! ঐ দেখেই আমি এত কথা আন্দাজ করিনি। তোমার জুতোর দিকে তাকালেই দেখবে, ওর নীচের দিকটায় লেগে রয়েছে ভিজে এঁটেল্-মাটি। ও-রকম মাটি কলকাতার কর্দ্দমাক্ত পথেও পাওয়া যায় না। দেখলেই বোঝা যায়, ও হচ্ছে গঙ্গামাটি। জুতো প'রে তুমি নিশ্চয়ই স্নান করবার জন্যে গঙ্গা-গর্ভে নামো নি। সুতরাং আন্দাজে বুঝলুম, তুমি নৌকা-যোগে গঙ্গা পার হয়েছ আর ভাঁটার সময় ব'লে নৌকা ছেড়ে নামতে বাধ্য হয়েছ ঘাট থেকে খানিক

দুরে, গঙ্গামাটির উপরেই। তোমার বোতাম-ঘরের ফুলটি খুব তাজা রয়েছে, সুতরাং বুঝতে পারলুম ওটি তুমি কলকাতা থেকে সঙ্গে ক'রে ওপারে নিয়ে যাওনি, তাহ'লে এতক্ষণে ফুলটি অল্পবিস্তর নেতিয়ে পড়ত। অতএব ফুলটিও তুলেছ অল্পক্ষণ আগে, গঙ্গার ওপারে গিয়েই—খুব সম্ভব, কলকাতায় ফেরবার সময়ে। আর বিলাতী মর্সুমী-ফুল 'কার্নেশান' তো ওপারের পথে-ঘাটে বনে-জঙ্গলে ফোটে না, সুতরাং ধ'রে নিলুম ওটি চয়ন করেছ তুমি কোন বাগান থেকেই। তোমার জুতোর গঙ্গামাটি এখনো শুকোবার সময় পায় নি। ঐ ভিজে মাটি দেখেই বুঝেছি, তুমি নৌকো থেকে নেমেই সিধে আমার বাড়ীতে এসে উঠেছ! দেখছ বন্ধু, একটু চেষ্টা করলেই মানুষ দেখে কত কথা আবিষ্কার করা যায়?"

আমি বললুম, "তুমি আশ্চর্য্য লোক, হেমন্ত! আমার সঙ্গে অনর্গল গল্প করতে করতে এত খুটিনাটি লক্ষ্য আর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করেছ!"

হেমন্ত বললে, "সবই অভ্যাসের ওপরে নির্ভর করে। আর মানুষের মন আর মুখ এক নয়। সে মুখে যখন এক কথা বলে, তার মন তখন অন্য কথা ভাবতে পারে।"

আমি বললুম, "কিন্তু চা কই—আমার চা?···এই মধু! জল্‌দি এক কাপ্‌ চা নিয়ে আয়!" মধু হচ্ছে হেমন্তের চাকরের নাম।

হেমন্ত বললে, "দালানে পায়ের শব্দ শুনছি। যখন খবর না দিয়েই আসছে, নিশ্চয় তখন চেনা লোক!"

বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকলেন সতীশবাবু এবং তাঁর পিছনে পিছনে আর একটি ভদ্রলোক—পরোনে তাঁর কোট-পেন্টলুন।

—"এই যে সতীশবাবু! আসুন, আসুন" ব'লেই হেমন্ত জিজ্ঞাসু-চোখে পিছনের ভদ্রলোকটির দিকে তাকালে।

সতীশবাবু বললেন, "ওঁকে চেনেন না বুঝি? উনি হচ্ছেন এ-অঞ্চলের বিখ্যাত ডাক্তার মিঃ, এ, দত্ত।"

—"মিঃ, এ, দত্ত? অর্থাৎ শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত? নমস্কার, নমস্কার! সতীশবাবু, উনি তো শুধু ডাক্তার নন, উনি যে রসায়ন-শাস্ত্র নিয়েও গবেষণা করেন, ইংরিজী কাগজে প্রবন্ধ লেখেন! মিঃ, দত্ত, এই কালকেই একখানি পত্রিকায় মানুষের দেহের ওপরে Butyl chloride-এর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আপনার একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পড়েছিলুম।"

সতীশবাবু বললেন, "আপনি এত খবরও রাখেন!"

মিঃ দত্ত লজ্জিত ভাবে বললেন, "হেমন্তবাবুর মত পণ্ডিত লোকের মুখে আমার সুখ্যাতি শুনে আমি গর্ব্ব অনুভব করছি!"

হেমন্ত অট্টহাস্য ক'রে বললে, "আমি আবার পণ্ডিত নাকি? মোটেই নয়—মোটেই নয়! জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে আমি খালি নুড়ি কুড়োবারই চেষ্টা করি! তা আমার পোড়াকপালে নুড়িও সহজে জোটে না! ওকি, আপনারা এখনো দাঁড়িয়ে রইলেন যে? বসুন, বসুন—ওরে মধু, আরো কাপ-দুয়েক চা আন্ রে!"

সতীশবাবু ও মিঃ দত্ত আসন গ্রহণ করলেন।

এখানে সতীশবাবুর একটুখানি পরিচয়ের দরকার। সতীশবাবু হচ্ছেন কলকাতা পুলিসের একজন নাম-করা ইনস্পেক্টার এবং হেমন্তের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিণত হয়েছে রীতিমত বন্ধুত্বে। তিনি প্রায়ই এখানে আসেন এবং অপরাধ-তত্ত্ব নিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে আলোচনা ক'রে যান। অনেক সাধারণ পুলিসের লোকের মত নিজেকে তিনি একজন সবজান্তা ও মস্ত-বড় মনুষ্য-রত্ন ব'লে বিবেচনা করেন না। কোন জটিল মামলা হাতে পেলে হেমন্তের সঙ্গে পরামর্শ করতে কুণ্ঠিত হন না একটুও।

চায়ের বারকোস হাতে ক'রে মধু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে।

সতীশবাবু বললেন, "হেমন্তবাবু, লিপ্টনের 'গ্রীন লেবেল' চায়ের লোভে আজ আমি এখানে আসিনি। আমি মহাসমস্যায় পড়েছি, তাই এসেছি আপনার কাছে সুপরামর্শ নিতে।"

হেমন্ত হাসিমুখে বললে, "সুপরামর্শ দেওয়া আর দাবা খেলার ওপর-চাল দেওয়া, দুই-ই খুব সহজ। সুতরাং সুপরামর্শ চেয়ে আপনাকে হতাশ হ'তে হবে না।"

সতীশবাবু চায়ের একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে বললেন, "না হেমন্তবাবু, ব্যাপারটাকে আপনি হাল্কা ভাবে নেবেন না। আমার থানার এলাকায় সহরের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি খুন হয়েছেন আর চুরি গিয়েছে নগদ আশী হাজার টাকা।"

হেমন্ত সোজা হয়ে ব'সে বললে, "কে খুন হয়েছে আর কার টাকা চুরি গিয়েছে?"

—"হত ব্যক্তির নাম মতিলাল মুখোপাধ্যায়। টাকা চুরি গেছে তাঁরই।"

—"হ্যাঁ, ও নাম আমি শুনেছি বটে। তিনি তো যদুগোপাল বসু ষ্ট্রীটে থাকতেন?"

—"হ্যাঁ। খুনী ধরা পড়ে নি।"

—"কোন সূত্র পাওয়া যায় নি?"

—"সূত্রও পেয়েছি কিছু-কিছু, কিন্তু এত এলোমেলো যে কাজে লাগাতে পারছি না। সন্দেহ করবার মত লোকও পেয়েছি, তবু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।"

হেমন্ত আবার কৌচের উপরে পা তুলে কুশনের উপরে হেলে পড়ল। তারপর দুই চোখ মুদে ফেলে বললে, "তাহ'লে আগে সব কথা শুনি। মিঃ দত্ত, চোখ মুদেছি ব'লে ভাববেন না আমি ঘুমোবার ফিকিরে আছি। সতীশবাবু আমার অভ্যাস জানেন, চোখ মুদলে আমার শোনবার আর চিন্তা করবার শক্তি দ্বিগুণ হয়ে ওঠে!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হত্যাকাহিনী

সতীশবাবু বলতে লাগলেন ঃ

"মতিলাল মুখোপাধ্যায় খুব ধনী লোক। ব্যাঙ্কে তাঁর প্রচুর টাকা জমা আছে, তা-ছাড়া কলকাতায় তাঁর বড় বড় বাড়ীও আছে অনেকগুলো।

তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। তিনি নিঃসন্তান। বছর-দুই আগে তাঁর স্ত্রীরও মৃত্যু হয়েছে। মতিবাবুর এক ভাগ্নে আছেন, তাঁর নাম বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়। তিনিই মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে মতিবাবুর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, ইদানিং তিনি 'ক্রণিক্' অজীর্ণ রোগে ভুগছিলেন। তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক হচ্ছেন ডাক্তার এ, দত্ত—যিনি আমার সঙ্গে এসেছেন। মিঃ দত্ত কেবল মতিবাবুর চিকিৎসক নন, তাঁর বিশেষ বন্ধুও। মতিবাবু লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে মোটেই ভালবাসতেন না, এত ধনী হয়েও তাঁর বন্ধুর সংখ্যা তিন-চারজনের বেশী নয়। ওঁদেরও মধ্যে প্রধান হচ্ছেন মিঃ দত্ত। কোন দরকারি বিষয়

নিয়ে পরামর্শের দরকার হ'লে মতিবাবু আগে মিঃ দত্তকে আহ্বান করতেন।

প্রাচীন বয়সে স্ত্রীর শোকেই হোক্ বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের জন্যেই হোক, কিছুকাল থেকে মতিবাবুকে নানারকম বাতিকে ধরেছিল।

কলকাতার বাড়ীগুলো তিনি একে একে বিক্রী ক'রে ফেলছিলেন। সেই বাড়া-বিক্রীর টাকা দিয়ে কিনে রাখছিলেন কোম্পানীর কাগজ।

গতকল্য বৈকালেও একখানা বাড়ী বিক্রী ক'রে তিনি আশী হাজার টাকা এনে নিজের শোবার ঘরের সিন্দুকের ভিতরে পূরে রেখেছিলেন। হাজার টাকার আশীখানা নোট।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই মতিবাবুর আর এক খেয়াল হয়েছিল। কিন্তু সেটা বলবার আগে তার বাড়ীর কিছু বর্ণনার দরকার।

মতিবাবুর বসত-বাড়ীখানা মস্ত বড়—তার তিনটে মহল। প্রথম—অর্থাৎ সদর মহলটা মদনগোপাল বসু ষ্ট্রীটের উপরেই। সর্বশেষের তৃতীয় মহলের পিছনে আছে কানা বিশ্বাস লেন। সেদিকেও একটা দরজা আছে।

এখন তার খেয়ালের কথা বলি। মতিবাবু আগে থাকতেন প্রথম মহলে, কিন্তু স্ত্রীর পরলোকগমনের পর থেকেই বড় রাস্তার ধার ছেড়ে তৃতীয় মহলে এসে বাস করতেন। তিনি অন্য কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন না, যে তিন-চারজন বিশেষ বন্ধু তার

সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন, তাঁরা আসতেন ঐ কালী বিশ্বাস লেন দিয়ে, তৃতীয় মহলে। এদিকেও আলাদা একটা সিঁড়ি আছে।

তৃতীয় মহলে ঢোকবার নীচেকার দরজায় কোন দ্বারবান থাকে না। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই মতিবাবুর ঘরের সামনে যে বারান্দা বা দালান পাওয়া যায় সেখানে দিনরাত বাঁধা থাকে প্রকাণ্ড এক মাষ্টিফ কুকুর। তাকে এড়িয়ে মতিবাবুর ঘরে ঢোকবার উপায় নেই। সে কেবল কামড়ায় না, অচেনা লোক দেখলেই বিষম চেঁচিয়ে পাড়া জাগিয়ে তোলে।

বাড়ীর প্রথম দুই মহলে বাস করেন মতিবাবুর ভাগিনেয় বিনোদলাল ও অন্যান্য কয়জন নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়—তাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক।

মাতুলের সম্পত্তির অবিরাম তত্ত্বাবধান ছাড়া বিনোদবাবু আর কোন কাজ করেন না। তবে আমি খবর নিয়ে জেনেছি যে, বিনোদবাবুর ঘোড়দৌড়ের নেশা আছে যথেষ্ট। এবং গোপনে এই নেশায় মেতে তিনি অনেক টাকা নষ্ট করেছেন, ফলে বাজারে তার ধারও সামান্য নয়।

তাঁর মাতুল এ-সব কথা জানতেন না, কিন্তু কথাগুলো জানতে পারেন আমাদের এই মিঃ দত্ত। তিনি এ পরিবারের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, কাজেই সব জেনে-শুনেও চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না, মতিবাবুর কাণে সব কথা তোলেন।

শুনেই তো মতিবাবু মহা ক্ষাপ্পা!—একেই তো তিনি

বেজায় কড়া লোক, তার উপরে জীবনে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করতেন যারা 'রেস্' বা জুয়া খেলে তাদের। তখনি বিনোদ-লালের তলব হ'ল। মামার কাছ থেকে বিষম বকুনি ও গালাগালি খেয়ে তাঁরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল, তিনিও মতিবাবুকে দু-এক কথা শুনিয়ে দিলেন। মতিবাবু রেগে অজ্ঞান হয়ে চীৎকার ক'রে বললেন, "জুয়াড়ীকে আমি আমার সম্পত্তির এক পয়সাও দেব না! আমি নতুন উইল করব।"

এই ব্যাপারটা হয়ে গেল কাল দুপুর-বেলায়। তারপর মতিবাবু বেরিয়ে অ্যাটর্নি-বাড়ীতে যান। সেখান থেকে আশী হাজার টাকা নিয়ে বৈকালে ফিরে আসেন।

সন্ধ্যার পর তাঁর শরীর কিছু খারাপ হয়। তিনি একটু সকাল-সকালই বিছানায় আশ্রয় নেন এবং শোবার আগে নিজের হাতে ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দেন। আপনারা জানেন, কাল সন্ধ্যায় অকাল-বর্ষা নেমেছিল? বৃষ্টি হয় ঘণ্টাখানেক ধ'রে।

বৃষ্টি থামে রাত ন'টার সময়। বাড়ীর নিয়মমত রাত সাড়ে-দশটার সময় দরোয়ান এসে কালী বিশ্বাস লেনের দিকের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে যায়।

আজ সকালে দেখা যায়, মেঝের উপরে মতিবাবুর মৃতদেহ প'ড়ে রয়েছে এবং ঘরের দরজা খোলা। কিন্তু বাড়ী থেকে রাস্তায় বেরুবার সব দরজাই বন্ধ।

খবর পেয়ে আমি গিয়ে যা দেখলুম তা হচ্ছে এই।

বিনোদলাল বালকের মত অধীর হয়ে কাঁদছেন আর মিঃ দত্ত তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন।

মতিবাবুর মৃতদেহ প'ড়ে রয়েছে ঠিক খাটের তলায়। তাঁর মুখের উপরে দারুণ যাতনা ও ভয়ের চিহ্ন—সেই সঙ্গে রয়েছে বিষম বিস্ময়েরও আভাস!

তাঁর গলার উপরে একটা নীল দাগ। বিছানার উপরে ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন। মতিবাবুর দেহের পাশে ছড়ানো রয়েছে একটা ভাঙা কাঁচের গেলাসের ছোট-বড় টুক্‌রো—কোন কোন কাঁচ রক্তাক্ত।

আর একটা আশ্চর্য্য জিনিষও পেয়েছি। খুব পুরু পশমের একটা দস্তানা!

ঘরের মেঝেতে কাদা-মাখা জুতোর দাগ আছে—দু-রকম জুতোর। কিন্তু কোন দাগ এমন স্পষ্ট বা সম্পূর্ণ নয় যে নিখুঁত মাপ বা ছাঁচ নেওয়া যেতে পারে। তবে দুজন লোক যে বৃষ্টির পরে এই ঘরের ভিতরে এসেছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ঘরের দরজার ঠিক বাইরেই যে একজন লোক দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিল, তার একজোড়া জুতোর স্পষ্ট ছাপ দেখেই সেটা অনুমান করা যায়। তার খাঁজ-কাটা সোলের ছাপ দেখলে আরো বোঝা যায়, সে এসেছিল রবারের জুতো প'রে। ঘরের মেঝেতেও এমনি রবারের জুতোর আংশিক ছাপ আছে। সুতরাং বুঝতে দেরি লাগে না যে, প্রথম একজন ঘরে ঢোকবার পরে সেও ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল।

দরজার বাইরেকার এই রবারের জুতোর ছাপ আমি নিয়েছি।

মতিবাবুর মৃতদেহ দেখলে মনে হয়, কেউ বা কারা গলা টিপে তাঁকে মেরে ফেলেছে।

তাঁর লোহার সিন্দুক খোলা, মতিবাবুর নিজের চাবি দিয়েই সেটা খোলা হয়েছে। ভিতর থেকে কেবল আশী হাজার টাকার নোটই অদৃশ্য হয়নি। মতিবাবুর টাকা খাটানোর ঝোঁকও ছিল। হ্যাণ্ডনোটেও তিনি টাকা ধার দিতেন। সিন্দুকের ভিতরে কতগুলো হ্যাণ্ডনোটও ছিল, সেগুলোও আর নেই। আর পাওয়া যাচ্ছে না মতিবাবুর পকেট-বইখানা! তাঁর রোজ ডায়ারি লেখার অভ্যাস ছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হত্যাকারী কে?

খুনী যে বাহির থেকে আসেনি তার প্রমাণ হচ্ছে প্রথমত, বাড়ীর সব বাইরের দরজাই ছিল ভিতর থেকে বন্ধ। দ্বিতীয়ত, বারান্দার মাষ্টিফ কুকুরটা কোন সাড়াশব্দ দেয়নি—তার মানে, খুনী তার অচেনা নয়।

বাড়ীর ভিতরে মেয়েদের কথা ছেড়ে দি। পুরুষ-আত্মীয় আছে মোটে চারজন। বিনোদলাল, একজন প্রায় সত্তর বছরের বুড়ো, একজন বাতে-পঙ্গু লোক, আর একটি পনেরো বছরের ছোকরা। বাকি সবাই চাকর-দ্বারবান প্রভৃতি। যদি ধরা যায়, টাকার লোভে তারা মনিবকে খুন করেছে, তাহ'লেও একটা প্রশ্ন জাগে। খুনীদের পায়ে জুতো ছিল, চাকর-দ্বারবানরা

বাড়ীর ভিতরে জুতো পরে না, পরলেও চুপি-চুপি কাজ সারবার জন্যে তারা খালি পায়েই আসত। তারা ডায়ারি চুরি করত না আর দস্তানাও পরত না।

বাড়ীর ভিতরে মতিবাবুর মৃত্যুতে লাভবান হবেন কেবল বিনোদলালই। খুনের দিনই তাঁর সঙ্গে মতিবাবুর ঝগড়া হয়েছিল এবং তাঁর মামা তাঁকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন ব'লে শাসিয়েছিলেন। তাঁর অনেক টাকা ধার, নগদ টাকার বিশেষ দরকার। তাঁকে অনায়াসে সন্দেহ করা যায়। হয়তো তাঁর আহ্বানেই মতিবাবু নিজে ভিতর থেকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন। কুকুর তাঁকে চেনে, তাই চ্যাঁচায় নি।

কিন্তু ঘটনাস্থলে খুনীর একজন সঙ্গীও হাজির ছিল। সে লোকটি কে? সমস্ত বাড়ী খুঁজে দেখেছি, রবারের জুতোর সঙ্গে কারুর জুতোর মাপ মেলে না। রবারের জুতোও বাড়ীর কারুর নেই।

হেমন্তবাবু, এই পর্য্যন্ত আমার কথা। এখন আপনি যদি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান, করুন। মিঃ দত্তকে সঙ্গে ক'রে এনেছি, তিনি অনেক বিষয়ে আপনার সন্দেহভঞ্জন করতে পারেন, কারণ তিনি হচ্ছেন মতিবাবুর পুরাণো বন্ধু।"

হেমন্ত চোখ খুলে বললে, "লাস কি শব-ব্যবচ্ছেদাগারে চালান ক'রে দিয়েছেন?"

—"না। ইচ্ছে করলে এখনো ঘটনাস্থলেই লাস দেখতে পারেন।"

হেমন্ত গাত্রোত্থান ক'রে বললে, "হ্যাঁ, সেই কথাই ভালো। রবীন, তুমিও এস।"

আমি হচ্ছি সাহিত্যিক মানুষ। লাস-ফাস দেখলে আমার প্রাণ হাঁস্‌ফাঁস্‌ করে, নাড়ি ছাড়ি-ছাড়ি হয়। তবু হেমন্তের কথা এড়াতে পারলুম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঘটনাস্থলে

আমরা কালী বিশ্বাস লেন দিয়ে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করলুম।

হেমন্ত আগে সমস্ত বাড়ীখানা ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে দেখলে।

তারপর মতিবাবুর শয়ন-গৃহের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দরোয়ানের জুতোর ছাপটা লক্ষ্য করলে। মাষ্টিফ-কুকুরটা আমাদের দেখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এবং মাঝে মাঝে গর্জ্জন করতে লাগল।

ঘরের ভিতর ঢুকে দেখলুম, মতিবাবুর মৃতদেহটা।

হেমন্ত লাসের পাশে ব'সে প'ড়ে বললে, "মিঃ দত্ত, আপনি তো ডাক্তার। আপনার কি বিশ্বাস? মতিবাবুকে কেউ কি গলা টিপে মেরে ফেলেছে?"

—"তা ছাড়া আর কি বলি বলুন?"

—"তাহ'লে ওঁর গলার ওপরে ঐ নীল দাগটা কিসের? ওটা তো আঙুলের দাগ নয়! হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন ওটা কোন স্বচ্ছ ব্যাণ্ডেজ। আঙুলের দাগ ও-রকম হয় না।"

—"আমার বোধহয় আঙুলের দাগ মিলিয়ে গিয়েছে। ওটা কালশিরার দাগ।"

'হুঁ, গেলাস-ভাঙা কাচে দস্তানার খানকটা কেটেও গিয়েছে দেখছি।'

—২৯ পৃষ্ঠা

—"সম্ভব। শব-ব্যবচ্ছেদ হবার পরই টের পাওয়া যাবে। আচ্ছা সতীশবাবু, বাংলাদেশে শীতকালেও কোন বাঙালী হাতে দস্তানা পরে নাকি?"

সতীশবাবু বললেন, "আমি তো জানি পরে না। অন্তত এ-বাড়ীর কেউ কোনদিন দস্তানা ব্যবহার করেনি ব'লেই জেনেছি।"

মেঝে থেকে দস্তানাটা তুলে নিয়ে হেমন্ত বললে, "অতিরিক্ত পুরু সাদা পশমের দস্তানা। এর ওপরেও রক্তের দাগ রয়েছে। হুঁ, গেলাস-ভাঙা কাঁচে দস্তানার খানিকটা কেটেও গিয়েছে দেখছি। কাঁচের গেলাসটাও ভাঙা, গেলাসের টুক্‌রোর ওপরেও রক্তের দাগ, আশ্চর্য্য!"

সতীশবাবু বললেন, "কেন, আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন কি কারণে?"

হেমন্ত আগে লাসটাকে একটু তুলে তার তলাটা পরীক্ষা করলে। তারপর বিছানার দিকে তাকিয়ে বললে, "এ কাঁচের গেলাসটা কি মতিবাবুর?"

—"হ্যাঁ, ঘরের ঐ কোণে গেলাসটা কুঁজোর মুখে বসানো থাকত। দেখুন না, কুঁজোর মুখ এখন আদুড়।"

—"বিছানার ওপরে ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন দেখে বোঝা যাচ্ছে, খুনীদের সঙ্গে মতিবাবু কিছুক্ষণ যুঝেছিলেন। ঘরের আর কোথাও ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন নেই। ধরুন, খুনীরা মতিবাবুর গলা টিপে ধরেছে, মতিবাবু ঝটাপটি করতে করতে মেঝের ওপরে

এসে কাবু হয়ে পড়লেন—কিন্তু গেলাসটা ভেঙেছিল তার আগেই, কারণ লাসের পিঠের তলাতেও ভাঙা কাঁচ রয়েছে।··· কিন্তু গেলাসটা ভাঙল কেন? আর গেলাসের কাঁচে খুনীর হাতই বা কাটল কেন? গেলাসটা তো আর হঠাৎ জ্যান্তো হয়ে পাখীর মতন পক্ষ বিস্তার ক'রে কুঁজোর মুখ ছেড়ে খুনীদের আক্রমণ করতে আসেনি? যদি বলি ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়ে খুনীদের কারুর হাতে গেলাসটা ছিল, তাহ'লেও প্রশ্ন ওঠে, গলা-টেপার সঙ্গে কাঁচের গেলাসের সম্পর্ক কি?"

সতীশবাবু প্রশংসা-ভরা কণ্ঠে বললেন, "ঠিক! হেমন্তবাবু, আপনি একটা মস্তবড় সূত্র আবিষ্কার করেছেন! এ কথা তো এতক্ষণ আমি ভেবে দেখিনি!"

হেমন্ত বললে, "গেলাসের নীচের দিকটা এখনো অটুট আছে দেখছি। কিন্তু ওর ভেতরটা একেবারে শুক্‌নো। তবু ওটাকে একবার পুলিসের পরীক্ষাগারে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। হয় তো ওর মধ্যে কোন বিষের অস্তিত্ব আছে। ওর গায়ে খুনীর আঙুলের ছাপও থাকা সম্ভব।"

সতীশবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সেটা আমিও আগে থাকতেই স্থির করেছি।"

—"আর এই দস্তানাটা কি আমাকে আজ্‌কের মত ধার দিতে পারেন?"

—"তা নিন্ না। কিন্তু কেন?"

—"আমি দস্তানাটার রক্ত পরীক্ষা করব।"

মিঃ দত্ত কৌতূহলী স্বরে বললেন, "তাতে কোন লাভ হবে নাকি ?"

—"হবে বৈকি, মিঃ দত্ত ! আপনি ডাক্তার, এটা নিশ্চয় জানেন যে, medico-legal মতানুসারে মানুষদের দেহের রক্ত মাত্র চার গ্রুপে বিভক্ত করা যায়। আপাতত আমি পরখ ক'রে দেখতে চাই, দস্তানার রক্ত কোন গ্রুপে বা শ্রেণীতে পড়ে। তাহ'লে খুনী গ্রেপ্তার হ'লে অনেকটা নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারবে, এ রক্ত তারই দেহ থেকে বেরিয়েছে কি না।"

মিঃ দত্ত বললেন, "হেমন্তবাবু, আমি জানতুম না যে, এদেশে গোয়েন্দার কাজে কেউ এমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। আপনি অবাক করলেন দেখছি। আজ বড় দুঃসময়ে আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল, নইলে আরো ভালো ক'রে আলাপ করতুম।"

হেমন্ত বিনীতভাবে বললে, "আমি খুব-রঙীন ফানুষ নই মিঃ দত্ত, দয়া ক'রে আমাকে এত-বেশী আকাশে তুলবেন না। আর আমার সঙ্গে যদি ভালো ক'রে আলাপ করতে চান, তাহ'লে অধীন সর্ব্বদাই আপনার দ্বারদেশে হাজির থাকতে রাজি আছে।"

মিঃ দত্ত হেমন্তের একখানি হাত ধ'রে বললেন, "দ্বারদেশে নয় হেমন্তবাবু, একেবারে আমার দোতালার ড্রয়িং-রুমে আপনাকে তুলে নিয়ে যেতে চাই। কাল বৈকালেই আমার ওখানে আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ রইল। কেমন, রাজি তো ?"

—“এ আমার সৌভাগ্য। কিন্তু আপনার ঠিকানা তো আমি জানি না।”

—“দশ নম্বর পরেশ মিত্র লেন। এখান থেকে ছ-সাত মিনিটের পথ।”

সতীশবাবু বললেন, “মিঃ দত্ত বেশ লোক যা হোক্! আমরা পড়লুম বাদ! এক যাত্রায় পৃথক ফল!”

মিঃ দত্ত বললেন, “নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই নয়! আপনিও যাবেন, রবীনবাবুও যাবেন!”

আমার কিন্তু গা ঘিন্-ঘিন্ করতে লাগল। সামনে প'ড়ে রয়েছে একটা খুন-করা মানুষের মৃতদেহ, বাড়ীর ভিতর থেকে আসছে আত্মীয়দের বুক-চাপা কান্না—এইখানে দাঁড়িয়ে কিনা নিমন্ত্রণের কথা! তারপরেই বুঝলুম, মিঃ দত্ত হচ্ছেন ডাক্তার —মড়া কেটে কেটে আর লোকের মৃত্যু দেখে দেখে তাঁর বুক হয়ে গেছে দরাজ; এবং সতীশবাবু হচ্ছেন পুলিসের পুরাণো লোক—জীবনে বহু নিহত মানুষের ভয়াবহ দেহ ঘেঁটে ঘেঁটে এ-সব দৃশ্য তাঁর চোখে হয়ে গেছে নেহাৎ সহজ, সুতরাং তাঁরও মনের বিকার না হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন শ্মশানের মুদ্দোফরাসরা; মৃতদেহ ভস্মসাৎ হ'লে পর তাদের তো চিতার আগুনেই হাঁড়ি চড়িয়ে ভাত রাঁধতে দেখা যায়!

মিঃ দত্ত নিজের হাতঘড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে ব্যস্ত হয়ে বললেন, “সাড়ে-আটটা বাজল! সতীশবাবু, আর তো আমার থাকবার উপায় নেই—ন'টার ভেতরেই আমাকে এক

রোগীর বাড়ী যেতে হবে। হেমন্তবাবু, আমাকে কি আর আপনার দরকার আছে ?”

হেমন্ত বললে, “না মিঃ দত্ত, আপনি অনায়াসেই যেতে পারেন।”

মিঃ দত্ত প্রস্থান করলেন। হেমন্ত খানিকক্ষণ লোহার সিন্দুকটা পরীক্ষা করলে। তারপরে বললে, “সতীশবাবু, এর চাবি কোথায় ?”

—“চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। বোধহয় খুনীর কাছে আছে। একগোছা চাবি। বাড়ীর ভেতরের লোকই যে এই খুনের সঙ্গে জড়িত আছে, এও তার আর-একটা প্রমাণ। বাইরের খুনী চাবি নিয়ে যাবে কেন ? যে চাবি নিয়ে গেছে, নিশ্চয় তার আরো কোন বদ্-মৎলোব আছে।”

হেমন্ত কিছু বললে না। নীরবে ঘরের মেঝের একদিকে তাকিয়ে ব'সে রইল। তারপর উঠে এগিয়ে গিয়ে মেঝের উপর থেকে এক টুক্‌রো শুক্‌নো কাদার মতন কি কুড়িয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ সেটা পরীক্ষা ক'রে বললে, “সতীশবাবু, বলুন দেখি এটা কি ?”

—“এক টুক্‌রো শুক্‌নো কাদা।”

—“হুঁ। ভিজে পথ দিয়ে হাঁটবার সময়ে খুনীদের কারুর জুতোর গোড়ালি আর ‘সোলে’র খাঁজে এই কাদাটা লেগে গিয়ে-ছিল। তারপর মতিবাবুর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করবার সময়ে কাদার টুক্‌রোটা গোড়ালি আর ‘সোলে’র খাঁজ থেকে খ'সে পড়েছে ”

আমি বললুম, "তুমি কি ক'রে জানলে যে ওটা আমাদেরই কারুর জুতো থেকে খ'সে পড়েনি ?"

—"দুটি কারণে। প্রথমত, আজ সকাল থেকে সহরের পথ-ঘাট শুকনো খট্‌খটে। এ ঘরে যারা ঢুকেছে তাঁদের কারুকেই কর্দ্দমাক্ত পথ দিয়ে হাঁটতে হয়নি। দ্বিতীয়ত, আমি খালি-চোখেই যতদূর দেখছি, এই কাদার ভেতরে কিঞ্চিৎ নূতনত্ব আছে।"

সতীশবাবু বললেন, "খুনীদের একজনের পায়ে ছিল রবারের জুতো। তার গোড়ালি সমতল, সুতরাং এ-রকম কাদার তাল জমবার উপায় নেই।"

—"ঠিক। অতএব এটি সংলগ্ন ছিল অন্য খুনীর জুতোর সঙ্গে। একে আমি এখন সযত্নে পকেটস্থ করলুম, বাড়ীতে গিয়ে অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করব।······সতীশবাবু, একবার বিনোদলালের সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা হবে কি ?"

—"নিশ্চয়ই হবে !" সতীশবাবুর হুকুমে তখনি একজন লোক বিনোদলালকে খবর দিতে গেল।

খানিক পরে একটি যুবক ভীত হরিণের মত চারিদিকে তাকাতে তাকাতে অত্যন্ত জড়োসড়ো হয়ে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল। ফর্সা রং, ছিপ্‌ছিপে দেহ, মুখ-চোখ সুন্দর। যুবকটি যে খুব সৌখীন দেখলেই তা বোঝা যায়। কিন্তু তার মাথার কেয়ারি-করা চুল আজ স্নান ও চিরুণির অভাবে এলোমেলো, চাকচিক্যহীন। পরোনে দামী রেশ্‌মী জামা

ও মিহি দেশী কাপড়, কিন্তু সেগুলোও মলিন পারিপাট্যহীন। তার চোখ ফোলা-ফোলা, দুই গালেও শুকনো অশ্রুর দাগ।— যেন বিয়োগান্ত নাটকের শেষ-দৃশ্যের 'হিরো'!

হেমন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবকের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল— অনেকক্ষণ ধ'রে। তার চোখদুটো দেখলে মনে হয়, তারা যেন যুবকের মনের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে চাইছে!

সেই তীব্রদৃষ্টি সইতে না পেরে যুবক মাথা নামিয়ে ঘরের মেঝের দিকে নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। তারপর কম্পিত স্বরে বললে, "আপনারা কি আমাকে ডেকেছেন?"

হেমন্ত বললে, "আপনার নাম কি?" তার স্বরের কঠোরতা দেখে বিস্মিত হলুম।

—"শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।"

—"কাল সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত আপনি কি করেছেন?"

—"কাল সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটা থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত আমি থিয়েটারে ছিলুম।"

—"বাড়ী ফিরেছেন কখন্?"

—"রাত দেড়টার সময়ে।"

—"মোটরে ক'রে এসেছিলেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"কোন্ থিয়েটারে গিয়েছিলেন?"

—"নাট্য-নিকেতনে।"

—"কোন্ দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢুকেছেন ?"

—"সদর দরজা দিয়ে !"

—"দরজা বন্ধ ছিল ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"কে খুলে দিয়েছিল ?"

—"দরোয়ান।"

—"কোন্ জামা প'রে থিয়েটারে গিয়েছিলেন ?"

—"যে জামাটা প'রে আছি।"

—"থিয়েটার থেকে আপনি সোজা বাড়ীতে এসেছিলেন ?"

একটু ইতস্তত ক'রে যুবক বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

হেমন্ত ধমকে ব'লে উঠল, "মিথ্যে কথা !"

—"আজ্ঞে—"

—"চুপ ! থিয়েটার থেকে আপনি বন্ধুবান্ধব নিয়ে হোটেলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে খাবার খেয়েছেন, নেশা করেছেন। আমার চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা করবেন না !"

বিনোদলালের মুখ হয়ে গেল মড়ার মতন হল্‌দে এবং তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল থর্-থর্ ক'রে।

হেমন্তের কণ্ঠস্বর হঠাৎ আবার অত্যন্ত কোমল হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে সে বললে, "বিনোদবাবু, ভবিষ্যতে আর কখনো মদ খাবেন না। মদ হচ্ছে মানুষের সব-চেয়ে বড় শত্রু—মানুষকে সে যে-কোন মুহূর্ত্তে নরকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। লক্ষ্য করলে দেখবেন, কোন পশুও মদ খায় না—কারণ সেটা স্বাভাবিক

পানীয় নয়। যে-জিনিষে পশুর রুচি নেই, মানুষ যদি তা খায়, তাহ'লে তাকে কি পশুরও অধম বলব না? আর একটা কথা মনে রাখবেন। কোন ভদ্রলোকেরই মিথ্যাকথা বলা উচিত নয়। মদ খাওয়া যে পাপ আপনিও তা জানেন। তাই সেই পাপ লুকোবার জন্যেই মিথ্যেকথা বলেছিলেন। যে-পাপ ভদ্রলোককে মিথ্যা বলতে বাধ্য করে, তার চেয়ে হীন আর কিছুই নেই। এখন আপনি যান, আমি আর-কিছু জানতে চাই না।"

দারুণ আতঙ্কে একবার হেমন্তের মুখের দিকে তাকিয়েই বিনোদলাল তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সতীশবাবু বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন, "হেমন্তবাবু! আপনি যে বিনোদকে চিন্‌তেন এ-কথা তো একবারও আমাকে বলেন নি!"

হেমন্ত বললে, "চিন্‌তুম মানে? আজ আমি এই প্রথম বিনোদকে দেখলুম, আজ সকালেও এর নাম পর্য্যন্ত জানতুম না!"

প্রায় হতভম্বের মত মুখ ক'রে সতীশবাবু বললেন, "তবে আপনি কেমন ক'রে বিনোদের এত গুপ্তকথা জানলেন?"

—"খুব সহজেই! ইচ্ছে বা চেষ্টা করলে আপনিও জানতে পারতেন! বিনোদ যখন বললে যে 'নাট্য-নিকেতন' থেকে মোটরে রাত বারোটার সময়ে বেরিয়ে বাড়ী ফিরেছে দেড়টার সময়ে, তখনি বুঝলুম সে সোজা বাড়ীতে আসেনি—কারণ 'নাট্য-নিকেতনে'র দূরত্ব এখান থেকে এক মাইলের

বেশী নয়। মনে প্রশ্ন উঠল, এই দেড় ঘণ্টা সময় সে কোথায় কাটিয়েছে? লক্ষ্য ক'রে দেখলুম, তার জামার হাতায় তরকারির হলুদে দাগ। জামায় পাণেরও ছোপ্ রয়েছে, জায়গায় জায়গায় পোড়া দাগ। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, কাল তার গায়ে ছিল এই জামাটাই। তরকারির দাগ দেখে অনুমান করলুম, থিয়েটার থেকে বাড়ীতে আসবার আগে সে কোন হোটেলে গিয়েছিল—কারণ সাধারণত থিয়েটার দেখে অত রাত্রে কেউ অন্য কোথাও নিমন্ত্রণ রাখতে যায় না। তারপর চিন্তা ক'রে দেখলুম, সিগারেটের আগুনের ফিন্‌কি লেগে জামায় নানা জায়গা পুড়ে যাওয়া, তরকারির দাগ আর পাণের ছোপ্ লাগা—এ-সব হচ্ছে অজ্ঞানতা আর অসাবধানতার লক্ষণ। নেশা না করলে কেউ এমন বেহুঁস হ'তে পারে না। সেইজন্যেই আন্দাজে বিনোদকে ঐ সব প্রশ্ন করেছি।"

সতীশবাবু বললেন, "অদ্ভুত আপনার তীক্ষ্ণদৃষ্টি! বিনোদকে দেখেই তার আসল চরিত্র আবিষ্কার ক'রে ফেললেন! কিন্তু কাল রাত দশটা পর্য্যন্ত বিনোদ কি করেছে, এ-কথা আপনি জানতে চাইলেন কেন?"

হেমন্ত সহাস্যে বললে, "এ জিজ্ঞাসার জবাব দেবার সময় এখনো হয়নি, আমাকে দয়া ক'রে মাপ করবেন।"

সতীশবাবু অনেকটা যেন নিজের মনে-মনেই মৃদুস্বরে বললেন, "হুঁ, বিনোদ খালি জুয়াই খেলে না, নেশাও করে! হয়তো তার আরো গুণ আছে!"

হেমন্ত বললে, "আচ্ছা সতীশবাবু, বিনোদ কাল কখন বাড়ীতে ফিরেছে দরোয়ানের কাছে সে খোঁজ নিয়েছেন কি ?"

—"নিয়েছি। রাত দেড়টার সময়েই।"

—"উত্তম। আর আমার কিছু দেখবার-শোনবার নেই। নমস্কার—"

সতীশবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, "এখনি যাবেন ? কোন সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছেন কি ?"

হেমন্ত বললে, "এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা আমার পক্ষে উচিত নয়। তবে এইটুকু জেনে রাখুন, ঘনীভূত অন্ধকারের ভেতরে আমি দু-একটি আলোক-রেখা দেখতে পেয়েছি বটে! চল রবীন, পলায়ন করা যাক্।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কলকাতায় বিলাতী 'ফগ্'!

রাস্তায় বেরিয়ে দেখলুম, আজ সহরের এ কী অবস্থা!

চারিদিক ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে যেন কুয়াশার ঘেরাটোপে। কলকাতায় যে এমন কুয়াশা হ'তে পারে, কখনো কল্পনা করিনি!

মুখ তুললে বোঝা যায় না মাথার উপরে লক্ষ তারার চুম্‌কী বসানো নীলাকাশ ব'লে কোন-কিছুর অস্তিত্ব আছে! এদিকে ওদিকে যেদিকে তাকাই—সমস্ত দৃশ্য যেন লুপ্ত হয়ে গেছে পুরু ধোঁয়া আর ধোঁয়ার জঠরে। যেখানে যেখানে গ্যাস-পোষ্ট আছে সেখানকার কুয়াশা কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে মাত্র, আলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। মাঝে-মাঝে পদশব্দ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু পথিকরা অদৃশ্য!

হেমন্ত বললে, "ও রবীন্, এ হ'ল কি হে! লণ্ডনের বিখ্যাত বিলিতী 'ফগ্' কি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের প্রধান সহরে বেড়াতে এসেছে?"

হেমন্ত রয়েছে আমার কাছ থেকে মাত্র এক হাত তফাতে, কিন্তু তাকেও দেখাচ্ছে যেন আবছায়ার মত!

একে মতিবাবুর বাড়ীর পিছন-দিককার এই সরু গলিটা সাধারণতই নির্জ্জন, তার উপরে শীতার্ত্ত রাত ও এই ভয়াবহ কুয়াটিকা! মনে হচ্ছে আমরা চলেছি নিস্তব্ধ এক অন্ধকার-রাজ্যের ভিতর দিয়ে অন্ধের মত!

পিছনে আবার একাধিক অদৃশ্য জুতোর শব্দ হ'ল।

আমি সাড়া দিয়ে বললুম, "কে আসে—সাবধান! আমাদের দেহের ওপরে যেন হোঁচট্ খাবেন না।"

পর-মুহূর্ত্তেই মাথার উপরে অনুভব করলুম প্রচণ্ড এক আঘাত এবং চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়ল রাশি রাশি সমুজ্জ্বল সর্ষে-ফুল এবং তারপরেই হারিয়ে ফেললুম জ্ঞান!……

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলুম জানি না। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শুনলুম হেমন্তর কণ্ঠস্বর—"রবীন, রবীন!"

—"অ্যাঁ? কি বলছ? উঃ।"

—"উঠে বোসো—"

হেমন্ত আমাকে ধ'রে তুলে বসিয়ে বললে, "তোমার মাথা ফেটে গেছে। এখনি ব্যাণ্ডেজ করা দরকার! তাড়াতাড়ি আমার বাড়ীতে যেতে পারবে?"

—"বোধহয় পারব। কিন্তু কে আমাকে আক্রমণ করলে?"

—"এখন কোন কথা নয়, আগে বাড়ীতে চল।"

……নিজের বাড়ীতে ফিরে হেমন্ত আমার ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা ক'রে বললে, "বড় বেঁচে গিয়েছ রবীন, আর-একটু হ'লেই আঘাতটা মারাত্মক হয়ে উঠত।" সে তাড়াতাড়ি

জল দিয়ে ক্ষতস্থানটা ধুয়ে ঔষধ প্রয়োগ ক'রে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বসল।

—"কিন্তু হেমন্ত, হঠাৎ আমার ওপরে গুণ্ডার আক্রমণ কেন ?"

—"গুণ্ডা নয় রবীন, হত্যাকারী !"

—"হত্যাকারী ?"

—"হ্যাঁ। এ হচ্ছে মতিবাবুর হত্যাকারীর কীর্ত্তি ! খালি তোমাকে নয়, আমাকেও আক্রমণ করেছিল।"

—"তুমি তাদের দেখতে পেয়েছ ?"

—"আবছায়ার মতন দেখেছি। দেখলেও চিনতে পারতুম না, তারা মুখোস প'রে এসেছিল।"

—"কিন্তু কেন ?"

—"তারা আমার পকেট থেকে সেই দস্তানাটা চুরি ক'রে পালিয়েছে।"

বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলুম। তারপর বললুম, "আমার সন্দেহ হচ্ছে, বিনোদের ওপরে। নিশ্চয় সে পাশের ঘরে লুকিয়ে ব'সে দস্তানা সম্বন্ধে তোমার মতামত শুনেছে।"

—"তারপর তার কোন অনুচরের সঙ্গে আমাদের পিছু নিয়েছে ?"

—"হুঁ। আজকের বিদ্‌কুটে কুয়াশা তার পক্ষে হয়েছে একটা মস্ত সুযোগ।"

—"দুর্য্যোগও হ'তে পারে রবীন।"

—"দুর্যোগ ?"

—"হ্যাঁ, খানিকটা তাই বৈকি !"

—"মানে ?"

—"এই দেখ !" হেমন্ত হাসতে হাসতে পকেট থেকে একখানা পকেট-বুক বার ক'রে সামনের টেবিলের উপরে রাখলে।

—"পকেট-বুক !"

—"হ্যাঁ।" পকেট-বুকখানা খুলে দু-এক পাতা উল্টে সে একটু বিস্মিত স্বরে বললে, "না, যা ভেবেছিলুম তা তো নয় !"

—"কী তুমি ভেবেছিলে ?"

—"ভেবেছিলুম এর মধ্যে দস্তানা-চোরের নামধাম• গুপ্তকথা পাব। এখন দেখছি এখানা হচ্ছে মতিবাবুর ডায়ারি !"

—"অ্যাঁঃ! তবে কি এইখানাই মতিবাবুর ঘর থেকে অদৃশ্য হয়েছে ?"

—"তাই তো বোধ হচ্ছে।"

—"এখানা তুমি কোত্থেকে পেলে ?"

—"পিক-পকেট যেখান থেকে চিরকালই গুপ্তধন আহরণ করে !"

—"হেমন্ত, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।"

—"শোনো। কুয়াশায় গা ঢেকে আজ আমাদের একসঙ্গে আক্রমণ করেছিল দুজন লোক। খুব সম্ভব তাদের হাতে ছিল

খাটো লোহার ডাণ্ডা। তারা নিশ্চয়ই আমাদের খুন করতে আসেনি, এসেছিল খালি ঐ দস্তানাটাই হাতাবার জন্যে। বোধহয় এই দস্তানা কেউ কেউ চেনে, দস্তানাটা দেখলে তারা মালিকের পরিচয় দিতে পারে। কিংবা অন্য কোন কারণও থাকতে পারে। কিন্তু সে কথা যাক্।······একজন তোমাকে আক্রমণ করে, আর একজন আমার মাথা লক্ষ্য ক'রে ডাণ্ডা মারে, কিন্তু ফস্কে যায়। সে আবার ডাণ্ডা তোলবার আগেই আমি তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বুক-পকেটে অনুভব করি এই ডায়ারিখানির অস্তিত্ব। তুমি জানো রবীন, খুব বিপদেও আমার মাথা গুলিয়ে যায় না। চোখের নিমেষ পড়বার আগেই আমি এক হাতে তাকে জড়িয়ে সাঁৎ ক'রে তার পকেটে আর এক হাত চালিয়ে ডায়ারিখানা তুলে নিলুম—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে অন্য লোকটা তোমাকে ছেড়ে আমারও মাথায় মারে ডাণ্ডা, আমিও মাটীর ওপরে প'ড়ে যাই। আমার মাথা ফাটেনি বটে, কিন্তু আচ্ছন্নের মতন হয়ে গেলুম। আমাকে সেই অবস্থায় পেয়ে দস্তানাটা নিয়ে তারা স'রে পড়ে। আমি যে পকেট মেরেছি এটা নিশ্চয়ই তারা জানতে পারেনি!"

—"চোরের ওপরে আচ্ছা বাটপাড়ি করেছ বটে।···কিন্তু হেমন্ত, ডায়ারি আর চাবির গোছা চুরি দেখে সত্যি-সত্যিই সন্দেহ হয় যে, বাড়ীর ভেতরের কোন লোকই মতিবাবুকে খুন করেছে। হ্যাঁ, সন্দেহ কেন, একরকম নিশ্চিত ভাবেই এ-কথা বলা যায়। বাইরের লোক খুন আর টাকা চুরি ক'রেই তুষ্ট

একটু ইতস্তত ক'রে যুবক বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—৬৬ পৃষ্ঠা

হ'ত—পরে মতিবাবুর চাবির গোছা আর ডায়ারি কোন কাজেই লাগাতে পারত না।"

ডায়ারির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হেমন্ত অন্যমনস্ক ভাবে বললে, "হ্যাঁ, সতিশবাবুরও ঐ মত।"

মিনিট পাঁচ-ছয় হেমন্ত ডায়ারি থেকে আর মুখ তুললে না। তারপর হঠাৎ উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, "পেয়েছি রবীন, ডায়ারি চুরির কারণ পেয়েছি! এই পাতাখানা ছাড়া ডায়ারির অন্য কোথাও আমাদের পক্ষে বিশেষ কোন দরকারি কথা নেই। শোনো—" ব'লেই পড়তে লাগল ঃ

"আমার শোবার ঘরের বড় টেবিলের ডানদিকের টানার পিছনের কাঠে একটি গুপ্তস্থান আছে। বাঁ-কোণের শেষ-প্রান্তে খুব ছোট একটি স্প্রিং আছে। সেটি টিপ্‌লেই গুপ্ত স্থানটি বেরিয়ে পড়বে। ওর মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার হীরা, চুণী, পান্না আর মুক্তা আছে। বৃদ্ধ হয়েছি, স্বাস্থ্য দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে, হঠাৎ যদি মারা পড়ি সেই ভয়ে আমার উত্তরাধিকারীর জন্যে এখানে এই কথাগুলি লিখে রাখলুম।"

—"রবীন, খুনী জানত যে, ডায়ারির মধ্যে এই গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যাবে!"

আমি দৃঢ় স্বরে বললুম, "তাহ'লে এই খুনী নিশ্চয়ই বাড়ীর ভিতরের লোক! এইজন্যেই সে চাবি চুরি করেছে! কাল তাড়াতাড়িতে ডায়ারি পড়তে পারে নি, খুব শীঘ্রই সে কাজ হাঁসিল করবে!"

—"করবে নাকি? দেখা যাক্!" ব'লেই হেমন্ত উঠে 'টেলিফোনে'র 'রিসিভার' তুলে নিয়ে থানার নম্বর বললে।

—"কে? সতীশবাবু? থানায় ফিরে এসেছেন? হ্যাঁ, আমি হেমন্ত। শুনুন। মতিবাবুর দেহ শব-ব্যবচ্ছেদাগারে পাঠিয়ে দিয়েছেন তো? বেশ। তাঁর শোবার ঘর বন্ধ আছে? উত্তম। কিন্তু একটা জরুরি কথা মনে রাখবেন। ও ঘরের দরজার সামনে সর্ব্বদাই যেন পাহারা রাখা হয়—কেউ যেন কোন কারণেই ও-ঘরে ঢুকতে না পায়। কেন? কারণ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এখনো প্রকাশ করবার সময় হয় নি। রাগ করবেন না, যথাসময়ে সমস্তই বলব।

......বলেন কি? যে কনষ্টেবল ভাঙা কাঁচের গেলাস নিয়ে একলা আসছিল, হঠাৎ পথে কারা তাকে আক্রমণ করেছে? তারপর? গেলাসটা ছিনিয়ে নিতে পারে নি? শুনে সুখী হলুম। কনেষ্টবল কারুকে চিনতে পারে নি? হ্যাঁ, কলকাতার আজকের কুয়াশাটা আশ্চর্য্যই বটে! অভূতপূর্ব্ব! কি বললেন? মিনিট-দুয়েক আগেই গলির মোড়ের কাছে কনষ্টেবল আর-এক পথিকের গায়ের ওপরে গিয়ে পড়ে? কে সে? বিনোদ? অত কুয়াশায় ওখানে সে কি করছিল? মাথা ধরেছে ব'লে বেড়াতে বেরিয়েছিল? এই বিশ্রী কুয়াশায়? আশ্চর্য্য ওজর তো! তাকে গ্রেপ্তার করবেন কিনা ভাবছেন? আপনার কর্ত্তব্য আপনিই ভালো বোঝেন, আমি আর কি বলব? এ-পথে আমি শিক্ষানবিস ছাড়া তো আর কিছুই

নই !·········হ্যাঁ, আমার কাছেও একটা নতুন খবর আছে। আমাকে আর রবীনকেও আজ কারা আক্রমণ করেছিল। রবীনের মাথা ফেটে গেছে। বেচারী! আমার খুব বেশী লাগে নি বটে, কিন্তু সেই দস্তানাটা লুট হয়ে গেছে—কনষ্টেবলের মত আমার ভাগ্য ভালো নয়। না, চিনতে পারি নি। একে কুয়াশা, তার ওপরে উপন্যাসের দুরাত্মাদের মত তারা মুখোস প'রে এসেছিল। না, না, এত রাতে আমাদের আর দেখতে আসতে হবে না, আমরা ভালোই আছি। আচ্ছা, নমস্কার।" আমার দিকে ফিরে সে বললে, "রবীন, সব শুনলে তো?"

অভিভূত কণ্ঠে বললুম, "ভাই হেমন্ত, এ যে আমরা সাংঘাতিক লোকের পাল্লায় পড়েছি! কাল খুন, আশী হাজার টাকা চুরি, আজ আমাদের আর কনষ্টেবলকে আক্রমণ! আমি ভাই কালিকলম নিয়ে নাড়াচাড়া করি, এত গোলমাল আমার ধাতে সহ্য হবে না তো!"

হেমন্ত বললে, "হুঁ, আমিও জানতুম বটতলার ডিটেক্‌টিভ নভেলেই এমন সব হৈ-হৈ কাণ্ড ঘটতে পারে!·········কিন্তু রবীন, বুঝতে পারছ কি, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো সরাবার জন্যে খুনীরা কি-রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে? উপন্যাসকেও সত্য ক'রে তুলতে চাইছে? কিন্তু কে তারা—কে তারা? কিছুই ধরতে পারছি না যে!"

আমি বললুম, "আচ্ছা, সতীশবাবুর কাছে তুমি একটা কথা ভাঙলে না কেন?"

দুষ্টুমি-ভরা হাসি হাসতে হাসতে হেমন্ত বললে, "কি কথা ?"

—"মতিবাবুর ডায়ারির কথা ?"

হেমন্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, "রবীন, আমার এ লুকোচুরি মার্জ্জনীয়। সত্যি কথা বলতে কি, এইটেই হবে আমার জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য 'কেস'। পুলিসের কাছে এর সমস্ত বাহাদুরিটা আমি একলাই অর্জ্জন করতে চাই। আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, আমি এ মামলাটার কিনারা করতে পারব। অবশ্য তারপরে আমি স'রে দাঁড়াব যবনিকার অন্তরালে—জনসাধারণের কাছ থেকে পুলিসকে ষোলো আনা সুখ্যাতি আদায় করবার অবসর দিয়ে।"

—"কিন্তু এ আগুন নিয়ে খেলা হচ্ছে, আমাদের প্রাণ যেতেও পারে।"

—"দেহের ভিতর থেকে এত-চট্‌পট্‌ প্রাণবায়ু যাতে বহির্গত না হয় সে-চেষ্টার ত্রুটি আমি করব না। কিন্তু···কি আশ্চর্য্য, আমি যে একটা মস্তবড় কথা ভুলে গিয়েছি রবীন !" ব'লেই হেমন্ত টপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে নিজের পকেটের ভিতরে হাত চালিয়ে দিলে।

—"কি খুঁজছ তুমি ?"

—"এইটে।" হেমন্ত বার করলে সেই কাগজের মোড়কটা —যার ভিতরে সে পূরে রেখেছিল খুনীর জুতো-থেকে-খসা খানিকটা শুক্‌নো কাদা।

মোড়কটা খুলে হেমন্ত আশ্বস্ত স্বরে বললে, "আঃ, বাঁচা গেল! কাদার টুকরোটা স্থানচ্যুতিতে গুঁড়িয়ে গেছে বটে, কিন্তু হারিয়ে যায় নি!"

আমি বললুম, "ঐ এক টুক্‌রো কাদাকে তুমি এমন অমূল্য নিধি ব'লে ভাবছ কেন? ওর ভেতর থেকে তুমি কি খুনীকে আবিষ্কার করতে চাও?"

—"আশ্চর্য্য কি? আমার সঙ্গে পরীক্ষাগারে এস।"

হেমন্ত তার পরীক্ষাগারে গিয়ে টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে পড়ল। তারপর অণুবীক্ষণ ও সেই মোড়কের শুক্‌নো কাদার গুঁড়ো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

এ-রকম পরীক্ষার মধ্যে আমি কিছু রস-কস্ পাই না। ঘরের এক কোণে মাটি দিয়ে তৈরি একটি গায়ের-ছাল-ছাড়ানো মানুষ-মূর্ত্তি দাঁড় করানো ছিল—আমি তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালুম। শিল্পী কেবল মূর্ত্তিই গড়ে নি, স্বাভাবিক সব রং বুলিয়ে নরদেহের ত্বকের তলায় যে-সমস্ত বিশেষত্ব থাকে তার প্রত্যেকটিই ফুটিয়ে তুলেছে। এ-সব দেখলে বেশ বোঝা যায়, পঞ্চভূত দিয়ে আমাদের দেহ তৈরি করতে ব'সে প্রকৃতি-দেবীকে কত মাথা খাটাতে, কত শিল্প-চাতুরী প্রকাশ করতে হয়েছে! আশ্চর্য্য ও রহস্যময় হচ্ছে মানুষের দেহের ভিতরটা!

এমন সময়ে হেমন্ত আমাকে ডেকে বললে, "এই শুক্‌নো কাদার ভেতরে কি কি আছে জানো?"

জানবার জন্যে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তবু বললুম, "কি কি আছে ?"

—"এর মধ্যে আছে চূণ আর বালি, সুরকি আর কয়লার গুঁড়ো। এগুলো মেশানো আছে কলকাতার পথের সাধারণ ধূলোর সঙ্গে।"

আমি বললুম, "চূণ, বালি, সুরকি আর কয়লাও মেলে কলকাতার যেখানে-সেখানে। এর কোনটাকেই আমি অসাধারণ ব'লে মনে করি না।"

—"করনা নাকি ? ও!" এই ব'লেই হেমন্ত একেবারে চুপ মেরে গেল। তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়, অত্যন্ত একমনে সে যেন কোন মহা-দরকারি কথা চিন্তা করছে।

খানিক পরে আমি বললুম, "দেখ ভায়া, এটা ভাবি বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু। শুকনো কাদার গুঁড়ো অর্থাৎ ধূলো নিয়ে এত-বেশী মাথা ঘামানো হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কের অপব্যবহার।"

হেমন্ত আমার পানে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল অন্যমনস্কের মত। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "প্রিয় রবীন, তুমি হ'চ্ছ একটি প্রকাণ্ড উজবুগ।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্রবীভূত বাতাস

পরদিন বৈকালে চললুম পরেশ মিত্র লেনে, মিঃ দত্তের চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে।

বিশেষ ক'রে কলকাতার উত্তর-অঞ্চলে সহরের শিরা-উপশিরার মত যে-সব ছোট ছোট গলি দেখা যায়, পরেশ-মিত্র লেনও হচ্ছে ঠিক সেই রকম। গলিটি চওড়ায় ছয়-সাত হাতের বেশী নয়, সাপের মত এঁকে-বেঁকে পাক খেয়ে ভিতর দিকে চ'লে গিয়েছে।

গলিটা প্রথম যেখানে মোড় ফিরছে সেইখানে বড় রাস্তা থেকেই দেখা গেল, একখানা নতুন বাড়ী প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে।

একটা জিনিষ আমি বরাবরই লক্ষ্য করেছি, ছেলেবেলা থেকেই সর্ব্ববিষয়েই হেমন্তের কৌতূহল হচ্ছে অসীম। হয়তো এটা ভালো ডিটেক্‌টিভের একটা বিশেষ লক্ষণ, কিন্তু ঠিক এই কারণেই তার সঙ্গে পথ চলা অনেক সময়ে কেবল বিরক্তিকরই নয়, নিরাপদও ছিল না।

একদিনের কথা বলি।

বাগবাজার দিয়ে যাচ্ছি আমরা দুজনে। রাস্তায় একটা বিঁড়িওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে কে হঠাৎ অট্টহাস্য ক'রে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল হেমন্ত। তিন, চার, ছয় মিনিট কেটে গেল, সেখান থেকে সে আর নড়বার নাম করে না।

আমি বিস্মিত হয়ে বললুম, "কি হে, ব্যাপার কি? এই দুপুর রোদে মাথার চাঁদি গরম হয়ে উঠল যে, আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে?"

হেমন্ত আমাকে একটু তফাতে টেনে এনে বললে, "রবীন, তুমি ওর দাঁত লক্ষ্য করেছ?"

—"দাঁত? কার দাঁত?"

—"ঐ যে লুঙ্গি-পরা লোকটা এখনি হা হা ক'রে হেসে উঠল? দেখ দেখ, আবার ও হাসছে! ওর দাঁত দেখ!"

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, "যাও যাও, বাজে বোকো না! পথে পথে লোকের দাঁত দেখে বেড়ানো আমার ব্যবসা নয়। চল" ব'লেই তার হাত ধ'রে টান মারলুম।

কিন্তু হেমন্তকে এক ইঞ্চি নড়াতে পারলুম না। সে বললে, "ওর শ্বদন্তগুলো কি-রকম অসম্ভব বড় আর লম্বা দেখেছ?"

—"শ্বদন্ত? শ্বদন্ত আবার কি?"

—"মূর্খ রবীন, তুমি সাহিত্য-চর্চ্চা ছেড়ে দাও। তুমি

ভালো গোয়েন্দা বা সাহিত্যিক কিছুই হ'তে পারবে না! মাতৃভাষা জানো না? শ্বদন্ত, অর্থাৎ canine tooth!"

—"সাহিত্যিকের কাজ নয় শ্বদন্ত নিয়ে তদন্ত করা। চলে এস।"

—"অসাধারণ ওর শ্বদন্ত। তার ওপরে ও আবার চৌকো চোয়ালের অধিকারী। যে সব বড় বড় পণ্ডিত অপরাধ-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা বলেন যে—"

—"তাঁরা কি বলেন আমি শুনতে চাই না। এখন তুমি আসবে কি না বল!"

—"উঁহু, এখন আমি যাব কোথায়? আমি আগে ও-লোকটার পরিচয় জানতে চাই!...ঐ দেখ, লোকটা এগিয়ে চলল! মস্তবড় লম্বা শ্বদন্ত, তার ওপরে চৌকো চোয়াল—সোনায় সোহাগা! এস রবীন, আমরাও ওর পিছনে পিছনে অগ্রসর হই!" হেমন্ত এমন বজ্র-মুষ্টিতে আমার হাতের কব্জি চেপে ধরল যে, তার হাত ছাড়ানো অসম্ভব!

বাগবাজারের মোড়ে এসে লোকটা চড়ল চিৎপুর রোডের বাসে। আমরাও বাসে চেপে কিনলুম টিকিট।

আমি চুপিচুপি বললুম, "এ যে বুনো হাঁসের পিছনে ছোটা হচ্ছে! ওর পরিচয় জেনে আমাদের কি লাভ?"

—"লাভ হয়তো কিছুই হবে না, হতাশ মুখে ফেরার সম্ভাবনাই প্রবল! কিন্তু আমি হচ্ছি অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞানের মতামতগুলো মেকি কিনা যাচাই করবার চেষ্টা করব না?"

মনে মনে হেমন্তের অপরাধ-বিজ্ঞানকে পাঠাতে চাইলুম জাহান্নমে। আরে মশাই, কি আপদ বলুন তো! চৈত্রমাসের তপ্ত দুপুর, পথের কুকুরগুলোও এখন ধুঁক্‌তে ধুঁকতে ঠাণ্ডা আশ্রয় খুঁজছে! কোথায় বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে, ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ ক'রে বিজলী-পাখার তলায় শীতলপাটি বিছিয়ে ব'সে বরফ দেওয়া সর্ব্বৎ পান করতে করতে রবি-ঠাকুরের কবিতা পড়ব, না ছুটে চলেছি এক মহাপাগ্‌লার সঙ্গে কোন্ শ্বদন্ত ও চৌকো চোয়ালের পিছনে! গ্রহের ফের আর কাকে বলে?

হতচ্ছাড়া শ্বদন্ত বাস থেকে নামল হারিসন রোডের মোড়ে। তারপর খানিক এগিয়ে একটা কফিখানায় গিয়ে ঢুকল।

হেমন্ত রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বললে, "লোকটার পরিচয় এখনো জানা হ'ল না তো! আমরাও কফিখানার খরিদ্দার হব নাকি?"

—"ভাই হেমন্ত, এইবারে দয়া ক'রে আমাকে মুক্তি দাও! তোমার শ্বদন্তের নাম-ধাম বংশ-পরিচয় তো আমার কাছে নেই, আমি অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্রও নই। আমাকে নিয়ে আর টানাটানি কর কেন?"

হেমন্ত মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে ভাবছে, অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য, এমন সময়ে বড়বাজার থানার এক ইন্‌স্পেক্টার সেখানে এসে হাজির হ'লেন।

—"আরে আরে, হেমন্তবাবু যে! এমন অসময়ে এখানে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছেন কেন?"

হেমন্ত কফিখানার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ক'রে বললে, "ঐ লোকটাকে দেখছি! ঐ যে, পরোনে ডোরা-কাটা সবুজ লুঙ্গী, গায়েও ডোরা-কাটা লাল গেঞ্জী, ব'সে ব'সে গোগ্রাসে মাংস গিলছে!"

ইন্‌স্পেক্টার প্রায় মিনিটখানেক ধ'রে ভালো ক'রে লোকটাকে দেখলেন, তারপর সবিস্ময়ে বললেন, "ব্যাটার সাহস তো কম নয়! দিনের বেলায় এখানে প্রকাশ্যে ব'সেই ফুর্ত্তি ক'রে খাবার খাচ্ছে! ধন্যবাদ হেমন্তবাবু, ওকে দেখিয়ে দিয়ে ভারি উপকার করলেন!"

—"কে ও?"

—"আবদুল মিয়া, মেছোবাজারের গুণ্ডা, দাগী আসামী, সাতবার জেল খেটেছে! আজ তিন দিন ধ'রে একটা খুনের মামলায় ওকে আমরা সারা কল্‌কাতা-ময় খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি আর ও কিনা আমাদের হাতের কাছেই খোস মেজাজে স্বশরীরে বর্ত্তমান!"

আবদুল তখনি ধরা পড়ল।

হেমন্তের দুই চোখ যেন নাচতে লাগল। বাড়ী ফেরবার জন্যে একখানা ট্যাক্সি ডেকে বললে, "ভায়া হে, অপরাধ-বিজ্ঞানের মাহাত্ম্যটা দেখলে তো?"......

...পরেশ মিত্র লেনের সেই প্রায়-সম্পূর্ণ বাড়ীখানা হঠাৎ হেমন্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

মিনিট-দুয়েক ধ'রে বাড়ীখানা দেখে সে বললে, "দেখ

নবীন, আজ কিছুকাল থেকে বাংলাদেশে নতুন এক উৎপাত শুরু হয়েছে। 'স্কাইস্‌ক্রেপার' নামে এক অদ্ভুত—এমন কি বেয়াড়া ধরণের বাড়ী আমরা আমেরিকায় দেখে এসেছি। আমেরিকার বায়স্কোপওয়ালারা এই কনারক মন্দির আর তাজমহলের দেশে এসেও সেই ঢঙে 'মেট্রো'-সিনেমার বাড়ী তৈরী করেছে। সেটা আমাদের চোখকে আঘাত দিলেও 'মেট্রো'র কর্তৃপক্ষকে দোষ দিতে চাই না। কারণ তারা হচ্ছে সেই দেশের লোক যারা বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুর ধ'রে আদর ক'রে মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। কিন্তু আজকাল বাঙালীরাও দেখছি কলকাতার পথে পথে 'স্কাইস্‌ক্রেপারে'র নকলে ঘরবাড়ী তৈরি করতে লজ্জিত হয় না। এই নতুন বাড়ীখানার দিকে চেয়ে দেখ। এই বিদেশী আদর্শের বদ-হজম সহ্য করা অসম্ভব। এমন অনুকরণপ্রিয় জাতি কোনদিনই স্বাধীন হ'তে পারবে না!"

বিরক্ত চোখে হেমন্ত আরো কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললুম, "তোমার স্থাপত্যের সমালোচনা রেখে এখন দশ নম্বরের বাড়ী খোঁজো। পাঁচটা বাজে যে, চায়ের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়!"

—"যাক গে উত্তীর্ণ হয়ে! এও অনুকরণ। আমরা কি ইংরেজ যে এই সময়ের মধ্যে আমাদেরও চা খেতে হবে?"

—"এস, এস, ও সব নিয়ে পরে আলোচনা করলেও চলবে। মিঃ দত্ত হয়তো আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

কিছুদূর এগিয়েই দশ নম্বরের বাড়ী পাওয়া গেল। দ্বারবানের উপরে বোধহয় আদেশ ছিল, আমাদের নাম শুনেই সে দোতালায় যেতে অনুরোধ করলে।

মিঃ দত্ত তাঁর দোতালার বৈঠকখানায় ব'সে সত্য সত্যই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। দেখলুম সতীশবাবু আমাদের আগেই সেখানে এসে হাজির হয়েছেন।

মিঃ দত্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, "হেমন্তবাবু, রবীনবাবু! কাল আপনারা কি সাংঘাতিক বিপদে পড়েছিলেন সতীশবাবুর মুখে তা শুনে স্তম্ভিত হয়েছি! রবীনবাবুর মাথায় এখনো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে যে! নিশ্চয় ওঁর খুব লেগেছে?"

আমি বললুম, "লাগেনি বললে মিথ্যা বলা হবে। মধু খেলে মিষ্টি লাগে, ডাণ্ডা খেলে কষ্ট পেতে হয়। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়ম।"

মিঃ দত্ত বললেন, "কিন্তু কে এই পাপিষ্ঠ? অনায়াসে যে খুন করছে, ভদ্রলোককে মারাত্মক আক্রমণ করছে, অথচ এখনো মেঘনাদের মতন লুকিয়ে আছে মেঘের আড়ালে? আমার তো মশাই, বাড়ী থেকে আর বেরুতে ভয় করছে!"

সতীশবাবু বললেন, "আপনার আবার কিসের ভয়? আপনি তো পুলিসের লোক নন?"

—"আমি পুলিসের লোক নই বটে, কিন্তু বন্ধু-হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে পুলিসকে তো সাহায্য করছি? খুনীদের রাগ আমার ওপরে পড়তে কতক্ষণ!"

সতীশবাবু বললেন, "ভয় নেই মিঃ দত্ত, আমরা বোধহয় শীঘ্রই খুনীকে ধরতে পারব। আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারেন ?"

—"আজ্ঞা করুন।"

—"আজ্ঞা নয় মিঃ দত্ত, অনুরোধ। আপনি তো মতিবাবুর বন্ধু, ও-পরিবারের অনেক খবরই রাখেন। বিনোদলালবাবু কোন কোন লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেন সে বিষয়ে আমাদের কোন খবর দিতে পারেন ?"

মিঃ দত্ত বিরক্ত ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "বিনোদের বন্ধুদের কথা আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবেন না !"

—"কেন বলুন দেখি ?"

—"তারা লোক ভালো নয়। তাদের বিশেষ পরিচয় আমি জানিনা বটে, তবে কানাঘুসোয় শুনেছি, বন্ধুদের চেষ্টাতেই বিনোদের পরকাল ঝর্ঝরে হয়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা চেষ্টা করবে না কেন ? মামার মৃত্যুর পরে বিনোদ হবে অগাধ সম্পত্তির মালিক, তারপরেই তো তাদের পোয়াবারো। কিন্তু যেতে দিন মশাই, ও-কথা যেতে দিন !"

হেমন্ত বললে, "সতীশবাবু, শব-ব্যবচ্ছেদাগারের খবর কি ?"

—"মতিবাবুর পাকস্থলীতে কোনরকম বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি, যদিও ডাক্তারদের আগে সেই সন্দেহই হয়েছিল। মতিবাবুকে কেউ গলা টিপে মেরে ফেলেছে কিনা, ডাক্তাররা জোর ক'রে সে কথাও বলতে পারছেন না, তবে

তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, ওটা মৃত্যুর কারণ হলেও হ'তে পারে। মতিবাবুর কণ্ঠের প্রত্যেক রক্তবহা নাড়িতে অতিশয় রক্তাধিক্যের লক্ষণ পাওয়া গেছে। নিশ্চয়ই বিষম জোরে তাঁর গলা টিপে ধরা হয়েছিল। ডাক্তারের রিপোর্ট তো এই, আপনার রিপোর্ট কি হেমন্তবাবু ?"

—"আমার রিপোর্ট ? আপাতত আমার কাছে রিপোর্ট করবার মতন কোন তথ্যই নেই।"

আমি উপহাসের স্বরে বললুম, "কেন হেমন্ত, তুমি তো অনায়াসেই তোমার সেই মহামূল্যবান শুক্‌নো কর্দ্দম-চূর্ণের কাহিনী বলতে পারো ?"

সতীশবাবু আগ্রহ-ভরে বললেন, "দোহাই হেমন্তবাবু, আপনার এই কর্দ্দম-চূর্ণের কাহিনী থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না !"

আমার দিকে একবার রেগে কট্‌মট্‌ ক'রে তাকিয়ে হেমন্ত বললে, "না সতীশবাবু, শোনেন কেন, এ-সব বিষয়ে আমার বন্ধুটি হচ্ছে পয়লা নম্বরের অপদার্থ। যে-ধূলোকে আমরা রাখি পায়ের তলায়, আধুনিক অপরাধ-বিজ্ঞানে তার স্থান যে কত উপরে, মূর্খ রবীন সে কথা জানে না।"

মিঃ দত্ত কৌতূহলী কণ্ঠে বললেন, "হেমন্তবাবু, এ-সব বিষয়ে আমিও কম-কাঁচা নই। আপনার মুখে একটুখানি ধূলোর ইতিহাস শুনতে চাই। ততক্ষণ বেয়ারারাও চা-টা নিয়ে আসবে !"

হেমন্ত বললে, "দেখুন, কিছুকাল আগেও অপরাধের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক ছিল না বিশেষ কিছুই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চুরি আর খুনের মামলার তদন্ত আরম্ভ হয়েছে খুব একালেই। আগে কোন লোকের উপরে সন্দেহ হ'লে তার কাছ থেকে স্বীকার-উক্তি আদায় করবার জন্য তাকে দেওয়া হ'ত অমানুষিক যন্ত্রণা। তার ফলে কেউ কেউ মারা পড়ত এবং অনেকে প্রাণের ভয়ে নির্দোষ হ'লেও মিথ্যা ব'লে অপরাধ স্বীকার করত। য়ুরোপে এমন সব ঘটনাও ঘটেছে, পুলিস সন্দেহ ক'রে একজনকে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলেছে, তারপর প্রকাশ পেয়েছে সত্যিকার অপরাধী হচ্ছে আর-একজন লোক। আসল কথা আগে অনেক ক্ষেত্রেই পুলিসের বুদ্ধির জোরে নয়, যন্ত্রণার চোটেই আসামীর অপরাধ প্রকাশ পেত।

"কিন্তু আজকের ধারা ভিন্নরকম। একালে পুলিস যদি যন্ত্রণা দিয়েও আসামীকে অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করে, তাহ'লে আদালতে তা গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু য়ুরোপের আধুনিক পুলিসকে যন্ত্রণার দ্বারা অপরাধীর দোষ আবিষ্কার করতে হয় না। তার কারণ পুলিস এখন বিজ্ঞানের সাহায্য পায়। অপরাধীর স্বীকার-অস্বীকার নিয়ে পুলিস মাথা ঘামায় না, ঘটনাস্থলে পাওয়া আসামীর ব্যবহার-করা কাপড়, জামা, জুতো, টুপী, লাঠি, ছোরা-ছুরি প্রভৃতি অনেক রকম জিনিষের ভিতর থেকে পুলিস বিজ্ঞানের সাহায্যে আশ্চর্য্য সব তথ্য আবিষ্কার করতে পারে। আসামী অপরাধ অস্বীকার করলেও দণ্ড থেকে মুক্তি পায় না।

এ-বিষয়ে নানাদিকে নানা কথা বলা যায়, কিন্তু আপাতত বলতে চাই কেবল ধূলোর কথা।

"আপনারা সকলেই নিশ্চয় জানেন যে, ধূলোর অগম্য ঠাঁই নেই। জানলা-দরজা বন্ধ ক'রে ঘরের ভিতরে একটা বাক্সে ঢাকনি-দেওয়া কৌটো রেখে দিন, তার মধ্যেও ধূলো ঢুকবে। সাধারণ চোখে সে-ধূলো যদি দেখতে না পাওয়া যায়, তবে অণুবীক্ষণ ব্যবহার করুন—দেখবেন কৌটোর ভিতরে বাস করছে নানারকম ধূলো! এক এক শ্রেণীর মানুষ যে কোন জিনিষ নিয়ে নিয়মিত ভাবে নাড়াচাড়া করবে, তার মধ্যে বিশেষ ক'রে পাওয়া যাবে-এক এক শ্রেণীর ধূলো! জার্ম্মানি-অষ্ট্রিয়া আর ফ্রান্সের পুলিসরা এ-বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে আলোচনা করেছে। অপরাধীদের ব্যবহৃত জিনিষগুলো হচ্ছে তাদের কাছে নাম-সই-করা স্বীকার-উক্তির চেয়েও মূল্যবান্।

"যারা পাঁউরুটি তৈরি করে তাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষের মধ্যে পাওয়া যায় গমের পালো বা শ্বেতসার। যাদের কাজ ধাতু নিয়ে তাদের জিনিষে মেলে অতি-সূক্ষ্ম ধাতব ধূলো। খনিতে যারা থাকে তাদের ব্যবহৃত জিনিষে থাকে খনিজ ধূলো। রাস্তায় যারা পাথর ভাঙে তাদের জিনিষ সূক্ষ্ম বালুময় ধূলোতে ভরা। এই রকম নানারকম জিনিষ অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা ক'রে অনায়াসে ব'লে দেওয়া যায় তাদের মালিক মিস্ত্রী, ছুতোর, কশাই, মুচি বা অন্য কোন্ শ্রেণীর লোক।

"প্রফেসর সেভেরিন্ ইকার্ড নানা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত

করেছেন, নিয়মিত ভাবে ব্যবহৃত ট্যাঁকঘড়ী বা হাতঘড়ীর ভিতরে যে ধূলো জমে তার সাহায্যে খুব সহজেই ব'লে দেওয়া চলে কোন্ শ্রেণীর লোক হচ্ছে ঘড়ির মালিক! এইবারে একটা সত্য গল্প বলি:

"বিলাতের এক পাড়াগাঁয়ে একবার একটি স্ত্রীলোককে কে খুন ক'রে পালায়। স্ত্রীলোকটির দেহে ছুরির আঘাত ছিল বটে, কিন্তু সে আঘাতই তার মৃত্যুর কারণ নয়। লাল ও নীল রেশমী সূতোর পাকানো দড়ীর ফাঁশ তার গলায় লাগিয়ে কেউ তাকে হত্যা ক'রে পথের ধারে ফেলে পালিয়ে গেছে।

"পুলিস দস্তুরমত বৈজ্ঞানিক প্রথায় তদন্ত সুরু করলে। হত স্ত্রীলোকটির পোষাকে পাওয়া গেল তামাকের ধূলো অর্থাৎ নস্য। তার জামা-কাপড়ের কোন কোন জায়গায় কয়লার গুঁড়োও দেখা গেল। তারও ওপরে আবিষ্কৃত হ'ল অভ্র, silicate of calcium আর magnesium প্রভৃতি খনিজ পদার্থের ধূলো।

"কিছুদিন পরে পুলিস সন্দেহ-ক্রমে একটা লোককে গ্রেপ্তার করলে। অণুবীক্ষণ দিয়ে তার আঙুলের নখের ফাঁকে দেখা গেল ঐ সব অভ্র, কয়লা আর অন্যান্য খনিজ পদার্থের অতি-সূক্ষ্ম ধূলো এবং—সব-চেয়ে যা সন্দেহজনক—লাল-নীল রেশমী সূতোর টুক্‌রো! জানা গেল সে নস্য নেয়। তার পকেটে একখানা ছুরি ছিল তাতেও রয়েছে অস্পষ্ট রক্তের ছাপ।

"আসামী বললে সে গ্যাসের কারখানায় আর খনিতে ঠিকে

কাজ করে। সে কারখানা আর খনির ঠিকানাও দিলে। কিন্তু তার নখের ফাঁকে যে-সব খনিজ পদার্থের ধূলো ছিল, তার দেওয়া কারখানা আর খনিতে গিয়ে সে-রকম ধূলো পাওয়া গেল না। কিন্তু যে গাঁয়ে নারীহত্যা হয়েছে, সেখানকার ধূলোয় মিশ্রিত খনিজ পদার্থের গুঁড়োর সঙ্গে আসামীর নখের ধূলো হুবহু মিলে গেল। তখন আসামী বাধ্য হয়ে অপরাধ স্বীকার করলে।

"ভেবে দেখুন, পুলিস যদি অণুবীক্ষণের সাহায্য গ্রহণ না করত, তাহ'লে হত স্ত্রীলোকটির পোষাক আর হত্যাকারীর নখের ফাঁক থেকে কিছুই আবিষ্কার করতে পারত না, কারণ যে-সব ধূলিকণা পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো কিছুতেই ধরা পড়ত না সাধারণ দৃষ্টিতে।

"আমিও এই পদ্ধতিতেই কাজ করবার চেষ্টা করি। মতিবাবুর লাসের পাশে যে-দস্তানাটা আমরা পেয়েছিলুম, সেটা খোয়া না গেলে আমিও হয়তো তার ভিতরকার ধূলো পরীক্ষা ক'রে অনায়াসেই বলতে পারতুম, দস্তানার মালিকের পেশা কি এবং দস্তানার ভিতরে ছিল কোন্ শ্রেণীর ধূলো! আশা করি আমার বক্তব্য আপনারা বুঝতে পেরেছেন, আর আমার বলবার কিছু নেই।"

সতীশবাবু বললেন, "হেমন্তবাবু, সেই শুক্‌নো কাদার গুঁড়ো তো আপনি পরীক্ষা করেছেন ব'লে শুনছি, তার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছেন?"

হেমন্ত অবহেলা-ভরে বললে, "ধূলো পেয়েছি বটে, কিন্তু অত্যন্ত বাজে ধূলো, কোন কাজে লাগবে ব'লে মনে হচ্ছে না! ...কই মিঃ দত্ত, কোথায় আপনার চা? এতক্ষণ তো পাগলের মতন ব'কে মরলুম, কিন্তু আর তো চা না হ'লে চলে না!"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়! বেয়ারা, এই বেয়ারা! জল্‌দি চা লে আও!"

চা এল, খাবার এল।

মিঃ দত্ত বললেন, "হেমন্তবাবু, আপনার লেক্‌চার শুনে আজ অনেক জ্ঞানলাভ করলুম; ধন্যবাদ!"

চা পান করতে করতে হেমন্ত বললে, "ঐ দরজাটার পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে যে-ঘরটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে শেল্‌ফের ওপরে অত শিশি-বোতল সাজানো কেন? ওটা কি আপনার ডিস্‌পেন্সারি?"

—"না হেমন্তবাবু, ওটা আমার ডিস্‌পেন্সারি নয়, ও-ঘরটি হচ্ছে আমার রসায়নাগার।"

—"রসায়নাগার?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি তো জানেন, রসায়ন-শাস্ত্র নিয়ে আমি অল্পবিস্তর পরীক্ষা-কার্য্য করি! যদিও জ্ঞান আমার সামান্য, তবু ঐ রসায়নাগারের পিছনে আমি অনেক টাকা খরচ ক'রেছি। আপনি ও-ঘরটি দেখবেন?"

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে হেমন্ত হাসতে হাসতে বললে, "রবীন জানে সব ব্যাপারেই আমার কৌতূহলের সীমা

নেই—বিশেষ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে! আমার লেক্‌চার তো শুনলেন, এইবারে রসায়ন-শাস্ত্র সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।"

—"আপনাকে নতুন কথা শোনাবার শক্তি আমার আছে ব'লে মনে হয় না। বড় জোর আমার রসায়নাগারটি আপনার মত গুণীকে দেখিয়ে ধন্য হ'তে পারি। চা খাওয়া হয়েছে? আসুন!"

মিঃ দত্তের সঙ্গে আমরা তিনজনেই পাশের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লুম। আমি এই রসায়নাগারের মধ্যে বিশেষ কোন নূতনত্ব পেলুম না, কারণ হেমন্তের পরীক্ষাগারের সাজসজ্জার সঙ্গে এরও মিল আছে অনেকটা। সেই শিশি, বোতল, জার অণুবীক্ষণ, কাঁচের মাপজোপের গেলাস ও বকযন্ত্র প্রভৃতি! তবে এই রসায়নাগারের জন্যে মিঃ দত্ত হেমন্তের চেয়ে ঢের বেশী টাকা খরচ করেছেন সেটা বুঝতে দেরি লাগে না।

আমি রসায়ন-রসে বঞ্চিত, কাজেই এ ঘরের যথার্থ মর্য্যাদা হয়তো বুঝতে পারলুম না। সতীশবাবুরও অবস্থা বোধহয় আমারই মত, কারণ বোকা বনবার ভয়ে তিনি একেবারে বোবা হয়ে গেলেন। কিন্তু সমঝদার হেমন্ত কৌতূহলে বালকের মতন চঞ্চল হয়ে উঠল। বিপুল আগ্রহে একবার এটা, একবার ওটা পরখ করে এবং প্রশ্নের পর প্রশ্নে মিঃ দত্তকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে দেয়।

—"ওটাতে কি আছে মিঃ দত্ত?"

মিঃ দত্ত হয়তো আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ ও অদ্ভুত এক

রাসায়নিক পদার্থের নাম করেন ও তার গুণাগুণ বুঝিয়ে দেন।

—"আর ওটাতে ?"

আবার একটা অচেনা নাম ও গুণাগুণের ব্যাখ্যা!

—"তাকের ওপরে শিশি-বোতলের সঙ্গে এই থার্মস্ ফ্লাস্কটাতে কি আছে মিঃ দত্ত ?"

—"লিকুউইড এয়ার!"

—"লিকুউইড এয়ার—অর্থাৎ তরল বা দ্রবীভূত বাতাস ? হাওয়াকেও আপনারা জলে পরিণত করেছেন—আশ্চর্য্য!"

—"কিছুই আশ্চর্য্য নয় হেমন্তবাবু! জল দেখা যায়, বাতাস দেখা যায় না। কিন্তু দুইই প্রবাহিত হয়, তাই বিজ্ঞানে বাতাসকেও বলে তরল জিনিস বা fluid!"

সতীশবাবু এতক্ষণ পরে বললেন, "কিন্তু fluid হলেও জলের মত এই দ্রবীভূত বাতাসকেও দেখা যায় না তো ?"

—"দেখা যায় বৈকি, খুব দেখা যায়! বাতাস একরকম গ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। বাতাসের তাপ যখন zero'র দুশো সত্তর ডিগ্রী নীচে নামানো যায়, বাতাস তখনি হয় দ্রবীভূত। তাকে তখন দেখতে হয় একরকম জলের মতই আর জলের মতই তাকে এক পাত্র থেকে আর এক পাত্রে ঢালা চলে। দ্রবীভূত জল বিষম ঠাণ্ডা। কিন্তু তার অবশিষ্ট তাপ আরও নীচে নামিয়ে আনলে সেটা জ'মে অধিকতর শীতল বরফ হয়ে পড়বে!"

আমি বিস্মিত স্বরে বললুম, "জলীয় বাতাস শুনেই চমকে

গিয়েছি, তারপরেও বাতাস হবে আবার নিরেট বরফ! অবাক কাণ্ড! তাকে তখন দেখাবে কি-রকম?”

—“অবিকল বরফের মতই। যদিও সেটা হবে এমন ঠাণ্ডা যে সাধারণ বরফকেও তখন গরম বলা যেতে পারবে। ঐ বাতাস-বরফের সাহায্যে রাসায়নিকরা—বাতাসেরও চেয়ে তো বটেই, পৃথিবীর সব-চেয়ে হাল্কা গ্যাসকে—অর্থাৎ হাইড্রোজেনকেও দ্রবীভূত করতে পারেন। আবার তার পরের ধাপ হচ্ছে বরফে পরিণত হাইড্রোজেন!”

সতীশবাবু বললেন, “ফ্লাস্কের মুখে ছিপি না দিয়ে তুলোর নুটি এঁটে রেখেছেন কেন মিঃ দত্ত? বাতাস দ্রবীভূত হ'লেও পালিয়ে যেতে পারে তো?”

—“দ্রবীভূত বাতাসও উপে যায় বটে। কিন্তু ফ্লাস্কের মুখে তুলোর বদলে ছিপি এঁটে রাখলে দ্রবীভূত বাতাস দড়াম্ ক'রে পাত্র ফেটে বেরিয়ে আসতে পারে!”

হেমন্ত হাসিমুখে বললে, “যাক্, আমাদের ঋণ গায়ে গায়ে শোধ হয়ে গেল মিঃ দত্ত! আমি শোনালুম সাধারণ ধূলোর কাহিনী, আর আপনি শোনালেন অসাধারণ দ্রবীভূত বাতাসের কাহিনী! অবশ্য গুণানুসারে আপনারই কৃতিত্ব বেশী। কিন্তু এই দ্রবীভূত বাতাস আপনার কোন্ কাজে লাগে?”

—“আমরা—অর্থাৎ রাসায়নিকরা—দ্রবীভূত বাতাসকে ব্যবহার করি অন্য জিনিষকে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা করবার জন্যে। একে অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে বিস্ফোরক রূপেও কাজে

লাগানো চলে। কিন্তু বাতাসকে দ্রবীভূত করা হচ্ছে বহুব্যয়সাধ্য, ধনী ছাড়া আর কেউ তা পারে না! রসায়নকে সখ ক'রে আমি প্রায় ফকির হ'তে বসেছি!"

হেমন্ত বললে, "আজ রাত হয়ে গেল মিঃ দত্ত, আপনার দামী সময় আর নষ্ট করব না। কিন্তু আগে থাকতে এটাও জানিয়ে রাখছি, আপনার মতন বিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য যখন হ'ল, তখন সহজে আপনাকে মুক্তি দেব না! আমি আবার এসে নতুন নতুন আশ্চর্য্য কথা শুনে যাব।"

মিঃ দত্ত একমুখ হেসে বললেন, "বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! অবশ্যই আসবেন, আমার বাড়ীতে আপনার অবারিত দ্বার জানবেন!"

ঘরের ভিতর থেকে বেরুতে বেরুতে হেমন্ত মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে বললে, "বাতাসের বরফ, বাতাসের বরফ! ধন্য বিজ্ঞান, ধন্য! এবারে এসে হয়তো খেয়ে যাব গন্ধের বরফি!"

মিঃ দত্ত হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, "না হেমন্তবাবু, আপনাকে অতটা বেশী সৌভাগ্যের অধিকারী বোধহয় করতে পারব না!"

পথ দিয়ে আসতে আসতে হেমন্ত আবার সেই নতুন বাড়ীখানার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি ভয় পেয়ে বললুম, "কি হে, আবার তুমি স্বদেশী আর বিদেশী স্থাপত্য নিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করবে নাকি?"

তারপর অণুবীক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

—৪৯ পৃষ্ঠা

—“না, না, নির্ভয় হও! এ বাড়ীখানা হচ্ছে আমার চক্ষুশূল!” ব’লেই সে হন্-হন্ ক’রে এগিয়ে চলল।

বড় রাস্তায় প’ড়ে সতীশবাবু বললেন, “এইবারে আমাকে থানার দিকে ফিরতে হবে। কিন্তু মিঃ দত্তকে কেমন লাগল?”

হেমন্ত উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, “চমৎকার, চমৎকার! অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লোক, তিলমাত্র পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই!” একটু থেমে স্বর বদ্‌লে সে আবার বললে, “সতীশবাবু, আপনাকে একটি ফর্দ্দ উপহার দিচ্ছি, কাজে লাগে কিনা দেখবেন!”

—“উপহার? কি উপহার দেবেন?”

—“একখানা কাগজ। মতিবাবুর যে নোটগুলো চুরি গিয়েছে এতে তাদের নম্বরগুলো টোকা আছে! এই নিন!”

অতিশয় বিস্মিত ভাবে সতীশবাবু বললেন, “অ্যাঁ! এ কাগজ আপনি কোথায় পেলেন?”

—“কোন কথা জিজ্ঞাসা না করলেই বাধিত হব। দিন-দুই-তিন বাদে সবই জানতে পারবেন। চল রবীন!”

হতভম্ব সতীশবাবুকে সেইখানে রেখে আমরা ধরলুম বাড়ীর পথ।

খানিক দূর এসে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “এ কাগজের কথা তুমি আমাকেও বলনি কেন?”

হেমন্ত বিরক্ত-ভরা কণ্ঠে বললে, “তোমাকে ব’লে লাভ? তুমি তো একটি আস্ত গাড়ল!”

—“গাড়ল?”

—"হ্যাঁ, প্রথম শ্রেণীর গর্দ্দভ। এখানে আমার শুক্‌নো কাদা নিয়ে পরীক্ষার কথা কে তোমাকে বলতে বলেছিল ?"

—"তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে ?"

—"তা নয়তো কি ? তোমাকে আগেই বলিনি, এ-মামলায় আমি পুলিসকে আমার হাতের তাস দেখাতে চাই না ?"

—"মাপ কর ভাই, ভুলে গিয়েছিলুম !"

হেমন্ত হেসে ফেলে বললে, "আচ্ছা, এ যাত্রা তোমাকে মাপ করা গেল !"

—"কিন্তু ঐ কাগজখানা ?"

—"কৌতূহলে তুমিও তো আমার চেয়ে কম যাও না দেখছি ! ও-কাগজ সম্বন্ধে কোন রহস্যই নেই। আজ সকালে মতিবাবুর ডায়ারিতেই পেয়েছি নোটের নম্বরগুলো। যে পাতায় নম্বরগুলো তোলা ছিল, খুনের দিনেই সেখানা লেখা হয়েছে। অর্থাৎ মতিবাবু ব্যাঙ্ক থেকে বৈকালে ফিরে এসেই নোটের নম্বর টুকে রেখেছিলেন।......হুঁ, মতিবাবু দেখছি খুব সাবধানী লোক ছিলেন !"

কালকের ও আজকের রাতে কত তফাৎ। কাল ছিল অভাবিত কুয়াশায় চারিদিক কালো, আর আজ আকাশ থেকে সহরের মাথায় ঝ'রে পড়ছে সোনার চাঁদের আলো !

হেমন্তও সেটা লক্ষ্য ক'রে বললে, "আজ তিন দিনে প্রকৃতি দেবী তিনরকম বেশ পরিবর্ত্তন করলেন। পরশু দেখলুম শীতের বাদল, কাল দেখলুম শীতের কুয়াশা, আর আজ

দেখছি শীতের জ্যোৎস্না! রবীন, তারপর আমাদের পিছনে পিছনে ও আবার কাকে দেখছি!"

ফিরে দেখলুম, মতিবাবুর ভাগ্নে বিনোদবাবু আসছেন। তাঁর চেহারা যেন আরো শুক্‌নো, রোগা ও ছন্নছাড়ার মত ব'লে বোধ হ'ল।

হেমন্ত বললে, "আরে আরে, বিনোদবাবু যে! এদিকে কি মনে ক'রে?"

—"কে, হেমন্তবাবু? রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় পথে পায়চারি করছি। আজকাল রোজ সন্ধ্যায় বিষম মাথা ধরছে! কিন্তু আপনারা এখানে কেন?"

—"মিঃ দত্ত আজ আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন।"

—"ও, তাই নাকি? আচ্ছা, আসি।" ব'লেই তিনি ফুটপাথ দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। তারপর আবার ফিরে এসে বললেন, "হেমন্তবাবু, মিঃ দত্ত কি আমার সম্বন্ধে কোন কথা আপনার কাছে বলেছেন?"

—"না। কিন্তু আপনার এমন সন্দেহের কারণ কি?"

বিনোদবাবু কিছুক্ষণ ইতস্তত ক'রে বললেন, "দেখুন হেমন্তবাবু, মিঃ দত্ত আমার হতভাগ্য মামার বিশেষ বন্ধু ছিলেন বটে, কিন্তু আমাকে বোধহয় তিনি পছন্দ করেন না। মামার মৃত্যুর দিনে তার সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হয়েছিল, এ-কথা আপনারা জানেন। কিন্তু তার আসল কারণ কি সেটা আপনারা শুনেছেন?"

—"আপনি রেস খেলেন ব'লে মতিবাবু আপনার ওপরে বিরক্ত হয়েছিলেন তো?"

—"হ্যাঁ। আর মামার কাছে সে-খবর দিয়েছিলেন ঐ মিঃ দত্তই। এটা কি তাঁর উচিত হয়েছে?"

—"কেন উচিত হয়নি? আপনি অসৎ সংসর্গে অধঃপতনে যাচ্ছিলেন, তাই তিনি মতিবাবুকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন আপনার মঙ্গলের জন্যে।"

বিনোদবাবু কেবল বললেন, "ও!"

হেমন্ত বললে, "আপনাকে আমিও একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

—"করুন।"

—"মতিবাবুর হত্যার জন্যে কারুর ওপর আপনার সন্দেহ হয় কি?"

—"সন্দেহ? কারুর ওপরে সন্দেহ করবার অধিকার আমার নেই।" ব'লেই বিনোদবাবু দ্রুতপদে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

আমরা আবার অগ্রসর হলুম। যেতে যেতে আমি বার বার পিছন ফিরে তাকাতে লাগলুম। কিন্তু বিনোদবাবু একেবারেই অদৃশ্য!

হেমন্ত উচ্চহাস্য ক'রে বললে, "রবীন, তুমি বারবার কেন যে পিছন ফিরে তাকাচ্ছ, সে-কথা আমি বলতে পারি।"—

—"বল দেখি!"

—"তোমার মনের ভাবটা হচ্ছে এই রকম। 'কাল রাতে পথে যখন আমাদের আর পাহারাওয়ালার ওপরে আক্রমণ হয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই ঘটনাস্থলের কাছে বিনোদকে দেখা গিয়েছিল। আজও হ'ল আমাদের পিছনে বিনোদের আকস্মিক আবির্ভাব! এর মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে কিনা—বিনোদ আবার লুকিয়ে আমাদের পিছনে আসছে কিনা?' কেমন, এই তো?"

হেমন্তের কথা যে সত্য, সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিনোদলালের অন্তর্ধান

পরদিন বৈকালে ব'সে ব'সে হেমন্তের সঙ্গে গল্প করছি, এমন সময়ে সতীশবাবু এসে ঢুকলেন ঘরের ভিতরে।

হেমন্ত বললে, "হঠাৎ এ সময়ে? কোন খবর-টবর আছে নাকি?"

সতীশবাবু চেয়ারের উপরে ব'সে প'ড়ে বললেন, "ভালো-মন্দ দুই খবরই আছে।"

—"যথা?"

—"সেই ভাঙা কাচের গেলাসের ওপরে আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে।"

—"হুঁ, সুখবর বটে।"

—"আমাদের পুরানো দপ্তর থেকে এক আসামীর আঙুলের ছাপ বেরিয়েছে। দুই ছাপই এক আঙুলের।"

সাগ্রহে আমাদের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে হেমন্ত বললে, "কে সেই আসামী?"

—"একে একে সব বলছি। বিশ বছর আগে জাল নোট চালাবার চেষ্টা ক'রে হরিহর নামে একটা লোক ধরা

প'ড়েছিল। কিন্তু মামলা যখন বিচারাধীন, সেই সময়েই একদিন সে হাজত থেকে স'রে প'ড়েছিল পুলিসকে ফাকি দিয়ে। তারই আঙুলের ছাপের সঙ্গে গেলাসের আঙুলের ছাপ মিলে গেছে অবিকল।"

—"সেই হরিহর এখন কোথায় ?"

—"কেউ তা জানে না। হয়তো তার আসল নাম হরিহরই নয়। যখন সে হাজতে ছিল তখন অনেক চেষ্টা ক'রেও পুলিস তার যথার্থ পরিচয় আদায় করতে পারে নি। তবে তার কথাবার্ত্তা হাব-ভাব ব্যবহারে এইটুকু অনুমান করা গিয়েছিল যে, সে ভালো ঘরের ছেলে আর সুশিক্ষিত। পুলিস যার-পর-নাই খোঁজ নিয়েও আর হরিহরের কোন পাত্তাই পায় নি। আজ বিশ বৎসর পরে হরিহরের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে ভাঙা গেলাসের কাঁচে। জালিয়াত অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে এসে হয়েছে হত্যাকারী। কিন্তু আবার সে অদৃশ্য হয়েছে।"

—"হরিহরের ছবি আপনাদের কাছে নেই ? সে নাম বদলাতে পারে, চেহারা বদলাতে পারবে না তো ?"

—"ছবি নিশ্চয়ই আছে। এই নিন্ তার লিপি।"

সতীশবাবু একখানা ফোটো বার ক'রে টেবিলের উপরে রাখলেন। আমি ঝুঁকে প'ড়ে দেখলুম, একটি অত্যন্ত শান্তশিষ্ট যুবকের চেহারা। চোখ বড় বড়, নাক টিকলো, দাড়ী-গোঁফ কামানো, মাথায় লম্বা চুল।

ছবিখানা খানিকক্ষণ মন দিয়ে দেখে হেমন্ত বললে, "বিশ বছর আগে হরিহরের বয়স ছিল কত ?"

—"বাইশ-চব্বিশের বেশী নয়।"

—"তাহ'লে আজ তার বয়স হবে বিয়াল্লিশ কি চুয়াল্লিশ। এতদিনে তার চেহারার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হওযা সম্ভব। আচ্ছা, ছবিখানা আজ আমার কাছে থাক্।"

আমি বললুম, "মতিবাবুকে খুন করতে এসেছিল দুজন লোক। বোঝা যাচ্ছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে হরিহর। কিন্তু আর একজন কে ?"

সতীশবাবু ম্লান হাসি হেসে বললেন, "সেটাও আমরা আন্দাজ করতে পেরেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেও পুলিসের হাত ছাড়িয়ে লম্বা দিয়েছে।"

হেমন্ত সবিস্ময়ে বললে, "পালিয়েছে। কে পালিয়েছে ?"

—"শুনুন। মতিবাবুর চোরাই নোটের নম্বরগুলো আপনি কি উপায়ে সংগ্রহ করেছেন জানি না, কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কারেন্সি থেকে আজই কেউ এমন দশখানা হাজার টাকার নোট ভাঙিয়ে নিয়ে গেছে, যার নম্বরগুলো আছে আপনারই দেওয়া কাগজে।"

—"বলেন কি মশাই ?"

—"হ্যাঁ। তারপরেই খবর পেলুম, আজ সকালে বিনোদ-লালকেও কারেন্সি আপিস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে।"

—"বিনোদবাবু কি বলেন ?"

—"আপাতত বিনোদের মতামত জানবার কোন উপায়ই আর নেই।"

—"মানে ?"

—"বিনোদ পালিয়ে গেছে !"

—"পালিয়ে গেছে ! বিনোদ পালিয়ে গেছে ?" উত্তেজিত ভাবে হেমন্ত চেয়ারের উপরে সিধে হয়ে বসল।

—"একেবারে নিরুদ্দেশ। ক'রেন্সি আপিস থেকে বাড়ীতে ফিরে এসে, আবার কখন্ যে'কোন্ পথ দিয়ে সে অদৃশ্য হয়েছে কেউ তা দেখতে পায় নি ! বিনোদের নামে ওয়ারেন্ট আমি তৈরি ক'রেই রেখেছিলুম, কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে দেখি খাঁচার ভেতরে পাখী আর নেই !"

হেমন্ত অর্দ্ধ-স্বগত স্বরে বললে, "বিনোদ পলাতক ! বিনোদকে দেখা গেছে কারেন্সিতে !"

অনুতাপ-ভরা কণ্ঠে সতীশবাবু বললেন, "কি অন্যায়ই করেছি ! গোড়া থেকেই ওর ওপরে আমার সন্দেহ হয়েছিল। তখনি যদি গ্রেপ্তার করতুম !"

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলুম যে, পালিয়ে গিয়ে বিনোদ নিজেই নিজের অপরাধটা ভালো ক'রে প্রমাণিত করলে। কিন্তু এই বীভৎস ব্যাপারে তার হাত ছিল কতখানি ? সে কি হরিহরেরই হুকুম তামিল করেছিল ? হরিহরও কি তার সঙ্গেই দেশছাড়া হয়েছে ?"

হেমন্ত হঠাৎ দৃঢ়স্বরে বললে, "নিশ্চিন্ত হ'ন সতীশবাবু! আমাকে আরো দিন-তিনেক সময় দিন! তার ভেতরেই বোধ হয় এ মামলাটার একটা কিনারা ক'রে ফেলতে পারব!"

সতীশবাবু বললেন, "এ মামলার একরকম কিনারা-তো ক'রে এনেছিই, পাজী বিনোদ গা-ঢাকা দিয়েই তো যত মুস্কিলে ফেললে!"

হেমন্ত বললে, "কিছু ভাববেন না সতীশবাবু, বিনোদলালকে আবার আপনার হাতের কাছে পাবেন খুব শীঘ্রই। পালিয়ে সে যাবে কোথায়? তাকে আপনার মুঠোর ভেতর এনে দেব—এই আমার পণ!"

আরো কিছুক্ষণ কথা ক'য়ে সতীশবাবু নিলেন বিদায়। হেমন্ত চিন্তিত মুখে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

আমি বাড়ী যাবার জন্যে যখন গাত্রোত্থান করলুম তখন সে বললে, "রবীন, আজ সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে আর সিনেমায় যেতে পারব না। আমার হাতে আজ অনেক কাজ আছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আবার খুন

প্রভাতী চা পান করতে করতে হেমন্তের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল, কুমারটুলির বিখ্যাত খাঁদা বা খোকা গুণ্ডার কথা।

হেমন্ত বলছিল, "এটা তো ইংরেজের আদালতে প্রমাণিত একটা সত্য ঘটনা! বাংলা, ইংরেজী সব কাগজেই এর বিবরণ বেরিয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখ রবীন, খাঁদা আর তার দলবল সন্ধ্যার পরেই গরাণহাটা থেকে একটা হতভাগ্য লোককে প্রকাশ্য ভাবে বন্দী ক'রে কলকাতার জনতাবহুল পথ দিয়ে খানিক খোলা ট্যাক্সিতে চ'ড়ে আর খানিক পায়ে হেঁটে শোভাবাজার ছাড়িয়ে এল; পথের উপরেই তাকে খুন করলে; তার কাটা মুণ্ড নিয়ে আবার বটতলায় এসে এক বন্ধুকে দেখিয়ে গেল; তারপর মুণ্ডটা গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়ে এল—অথচ কেউ তাকে কোন বাধা দিতে পারলে না, পথিকরাও নয়, পুলিসও নয়। কোন উপন্যাসে এমন ঘটনা থাকলে সমালোচকরা অস্বাভাবিক গাঁজাখুরি ব'লে চেঁচিয়ে ফাটাতেন সারা আকাশখানা! কিন্তু এখন তারা কি বলবেন?"

এমন সময়ে অত্যন্ত হন্তদন্তের মত সতীশবাবুর সশব্দে আবির্ভাব!

হেমন্ত বললে, "কি হয়েছে? আপনার চেহারার অবস্থা তো ভাল নয়?"

—"আবার খুন!" ব'লে সতীশবাবু ধপাস্ ক'রে চেয়ারের উপরে ব'সে পড়লেন।

হেমন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "খুন?"

—"হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ! আবার খুন হয়েছে আর খুনী নিশ্চয়ই সেই বিনোদ!"

—"আপনি কি বলছেন সতীশবাবু? বিনোদ খুন করেছে? কাকে? মিঃ দত্তকে নয় তো?"

—"মিঃ দত্তকে সে কেন খুন করবে?"

—"তার ওপরে বিনোদ মোটেই খুসি নয়।"

—"না হেমন্তবাবু, খুন হয়েছে একটা নতুন লোক—কিন্তু মতিবাবুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে লিপ্ত আছে ব'লে তাকেও আমরা খুঁজছিলুম।"

হেমন্ত আবার ব'সে প'ড়ে বললে, "ভালো ক'রে সব কথা গুছিয়ে বলুন।"

—"বলি। ভোর-বেলায় খবর পেলুম, গঙ্গার ধারে একটা মড়া প'ড়ে আছে। দেখতে গেলুম, এমন প্রায়ই যেতে হয়, কারণ গঙ্গার ধারে লাস পাওয়া নতুন কথা নয়। কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়েই আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। একটা জোয়ান লোকের

লাস, আর সে মারা পড়েছে ঠিক মতিবাবুর মতই ! মুখে সেই আতঙ্ক, বিস্ময় আর যন্ত্রণার চিহ্ন আর গলায় সেই সাংঘাতিক নীল দাগ !”

—“নীল দাগ !”

—“হ্যাঁ। তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। পরীক্ষা ক'রে বোঝা গেল, লোকটাকে অন্য কোথাও খুন ক'রে তার লাসটাকে এখানে ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে। লোকটাকে এখনো কেউ সনাক্ত করতে আসে নি। গায়ে পাঞ্জাবী, তার পকেটে পেলুম একখানা ছোরা—সুতরাং মানুষটি গোবেচারা ছিল না। পরোনে পাজামা, পায়ে রবারের জুতো।”

—“রবারের জুতো ?”

—“যা সন্দেহ করছেন তা মিথ্যে নয়। গলায় নীল দাগের সঙ্গে পায়ে রবারের জুতো দেখে আমারও সন্দেহ জেগে উঠল। মতিবাবুর বাড়ীতে হত্যাকারীদের একজনের যে রবারের জুতোর মাপ আমরা নিয়েছিলুম, তার সঙ্গে এই জুতোর মাপ একেবারে ঠিকঠাক মিলে গেল।”

—“এই লোকটাই সেই ভূতপূর্ব্ব জালিয়াত হরিহর নয় তো ?”

—“না। এর আঙুলের ছাপ অন্যরকম।”

—“তাহ'লে মতিবাবুর দুই খুনীর একজনের সন্ধান পাওয়া গেল ?”

—“তাইতো মনে হচ্ছে। আর-এক খুনী নিশ্চয়ই বিনোদলাল। কিন্তু সে তো পলাতক !”

—"তাহ'লে এই নতুন হত্যার জন্যে কার ওপরে আপনার সন্দেহ হয় ?"

—"ঐ বিনোদের ওপরেই। হেমন্তবাবু, আমার দৃঢবিশ্বাস যে, বিনোদ এই কলকাতাতেই গা-ঢাকা দিয়ে ব'সে আছে। খুব সম্ভব, তার সঙ্গে এই লোকটা চোরাই নোটের অংশ নিয়ে গোল-মাল করেছিল, কিংবা এ তাকে কোনরকম ভয় দেখিয়েছিল, তাই বিনোদ গলা টিপে একে বধ ক'রে নিজের পথ সাফ করেছে।"

অল্পক্ষণ ভেবে হেমন্ত বললে, "কেসটা দাঁড় করিয়েছেন মন্দ নয়, কেবল ধোপে টিকলে হয়।"

—"কেন ?"

—"তাহ'লে এর মধ্যে হরিহরের স্থান কোথায় ?"

—"সেইটেই ভালো ক'রে বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো পরে বোঝা যাবে। আপনি কি লাসটাকে দেখবেন ?"

হেমন্ত তাচ্ছিল্য-ভরা কণ্ঠে বললে, "দরকার কি ? আমি যে ঘটনার মালা গেঁথেছি এটা হচ্ছে তারই একটা ঘটনা মাত্র। এর পরেও যদি দু-দশটা খুন হয়, তাহ'লেও আমার ঘটনার মালা নতুন ক'রে গাঁথতে হবে না !" একটু থেমে হঠাৎ স্বর বদলে সে আবার বললে, "সতীশবাবু, খুনীকে আপনি আজকেই গ্রেপ্তার করতে চান ?"

সতীশবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললেন, "সে কি ! বিনোদ কোথায় আছে আপনি জানেন ?"

—"তা নিয়ে আপাতত আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

কারণ, আমি তো আগেই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, বিনোদকে আমি আবার আবিষ্কার করবই ! আপাতত বিনোদ সম্বন্ধে সমস্ত ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এখন যা বলি মন দিয়ে শুনুন। আজ বৈকালে রবীনকে নিয়ে আমি মতিবাবুর শয়ন গৃহে যেতে চাই। মিঃ দত্তকেও দরকার হবে, তিনিও এই খুনী-ধরা ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।...আপনাকে আরো যা যা করতে হবে বলছি, পাশের ঘরে চলুন। সেই সঙ্গে একটা নতুন জিনিষও দেখাব।"

সতীশবাবুর সঙ্গে আমিও পাশের ঘরে যাব ব'লে ওঠবার উপক্রম করছি, হেমন্ত হেসে উঠে বললে, "না রবীন, কৌতূহল দমন কর—তুমি এই ঘরেই থাকো। তাহ'লে আজ যখন এই রহস্য-নাট্যের শেষ-দৃশ্যের ওপরে পড়বে যবনিকা, তখন তার বিস্ময়টা তুমি রীতিমত উপভোগ করতে পারবে।"

সতীশবাবুকে নিয়ে হেমন্ত তার পরীক্ষা-ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল—আমি একলা বিরক্ত মনে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম।

প্রায় আধ-ঘণ্টা ধ'রে ওদের দুজনের মধ্যে ফিস্-ফাস্ ক'রে কি কথাবার্ত্তা হ'ল কিছুই শুনতে পেলুম না—যদিও শোনবার জন্যে আমার প্রাণ করছিল ছট্‌ফট্‌ !

শেষের দিকে কেবল একবার শুনতে পেলুম, সতীশবাবু সবিস্ময়ে বলছেন, "কি আশ্চর্য্য ! কি আশ্চর্য্য !"

বিস্ময়ের কারণটা আবিষ্কার করতে না পেরে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। এবং এই লুকোচুরির জন্যে হেমন্তকে অভিশাপ দিতে লাগলুম বারংবার !

নবম পরিচ্ছেদ

দস্তানার পুনরাবির্ভাব।

বৈকালে হেমন্তের সঙ্গে আমি আবার সেই ভযাবহ ঘবেব ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। মতিবাবুর শযন-ঘর।

সারা বাড়ীটা ঠিক সমাধির মতন নীবব। লোকজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তারা সবাই যেন ভযে দমবন্ধ ক'বে একেবারে চুপ মেবে গেছে।

মতিবাবুব শূন্য শয্যার দিকে তাকিযে মনের ভিতবটা খচ্‌-খচ্‌ করতে লাগল। এই তো মানুষের জীবন। কত সাধে পাতে নরম বিছানা, কিন্তু শোবাব আগেই হঠাৎ বেজে ওঠে মহাকালেব ঘণ্টা ঢং, ঢং, ঢং।

খানিক পরেই মিঃ দত্ত এসে হাজির।

হেমন্ত বললে, "আসুন মিঃ দত্ত, নমস্কাব। আজও আর-একবার আপনাকে কস্ট দিলুম।"

—"কষ্ট ? কিছুমাত্র না। আপনাদের সাহায্য করতে আমি সববদাই প্রস্তুত। বলুন আমায় কি করতে হবে ?"

—"দু-চারটে কথা জানতে চাই। নতুন খুনের কাহিনীটা শুনেছেন তো ?"

—"সতীশবাবুর মুখে শুনলুম। এ কি ভীষণ ব্যাপার, ভয়ে আমার বুক কাঁপছে মশাই।"

—"বিনোদবাবু পলাতক।"

—"সব শুনেছি। বিশেষ সন্দেহজনক।"

—"কিন্তু খুনীকে আমি গ্রেপ্তার করবই।"

—"না হেমন্তবাবু, বিনোদ যে এমন ভয়ানক কাজ করতে পারে এ আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।"

—"মানুষ চেনা বড় কঠিন মিঃ দত্ত, বড়ই কঠিন। কিন্তু দু-দুটো খুন ক'রে খুনী পালিয়ে যাবে কোথায়? আমার বিশ্বাস সে এইখানেই আছে।"

আশ্চর্য্য হয়ে মিঃ দত্ত বললেন, "কোথায়?"

—"এই বাড়ীতেই। মিঃ দত্ত, এ বাড়ীখানা যেমন মস্ত, তেমনি সেকেলে। এখানে আনাগোনা করছেন আপনি অনেক দিন। আপনি কি বলতে পারেন, এ বাড়ীর কোথাও কোন চোর-কুঠরী আছে কিনা? সেকেলে বাড়ীতে প্রায় চোর-কুঠরী থাকত।"

—"আপনি কি মনে করেন বিনোদ এই বাড়ীতেই লুকিয়ে আছে? তা কেমন ক'রে হবে? না মশাই, আমি কোন চোর-কুঠরীর সন্ধান-টন্ধান জানি না।"

—"মতিবাবুর মুখেও কোনদিন শোনেন নি?"

—"না।"

—"আচ্ছা, আমার কাছে ভালো ক'রে এই বাড়ীটার বর্ণনা করতে পারেন?"

—"তা নিশ্চয়ই পারি। এ বাড়ীর সবটাই আছে আমার নখদর্পণে।"

তারপর প্রায় আধ-ঘণ্টা ধ'রে দু'জনের মধ্যে চলল প্রশ্নোত্তরের ঘটা। শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠলুম। মনে হ'ল সমস্তটাই যেন অর্থহীন। বিনোদ নিশ্চয়ই এ-বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে নেই—সে এমন কাঁচা ছেলে নয়। হেমন্তের ধারণা ভুল।

হঠাৎ একজন পাহারাওয়ালা এসে জানালে, ইন্স্পেক্টার-বাবুর কাছ থেকে একজন লোক হেমন্তবাবুকে ডাকতে এসেছে!

—"আমাকে? আমাকে আবার কি দরকার—বল-গে যাও. আমি এখন ভারি ব্যস্ত। আচ্ছা থাক্, আমি নিজেই যাচ্ছি। এস তো রবীন, খবরটা কি শুনে আসি।"

আমরা নীচে নেমে গেলুম। কিন্তু নীচে গিয়ে কারুকেই দেখতে পেলুম না।

হেমন্ত বললে, "কে ডাকতে এসেছে? গেল কোথায়?"

মিনিট-ছয় অপেক্ষা ক'রেও কারুর দেখা পাওয়া গেল না।

হেমন্ত বিরক্ত স্বরে বললে, "চুলোয় যাক্ ইন্স্পেক্টার-বাবুর লোক! আমার এখন অনেক কাজ। চল, আবার ওপরেই যাই।"

ঘরে ঢুকে হেমন্ত আবার টেবিলের সামনে গিয়ে ব'সে পড়ল।

মিঃ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এসেছিল?"

—"কেউ না। কেবল মিছে সময় নষ্ট হ'ল। হ্যাঁ, কি বলছিলেন? এ বাড়ীর সিঁড়ির তলায় চোর-কুঠরীর মত একটা ঘর আছে, কিন্তু সে ঘরে কয়লা থাকে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তাহ'লে আপনার মতে বিনোদ এখানে নেই?"

—"না।"

মিনিট-পাঁচেক ধরে হেমন্ত গম্ভীর মুখে ভাবতে লাগল।

তারপর ঘরের বাইরে সিঁড়ির উপরে শুনলুম ভারি ভারি পায়ের শব্দ! দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন হাসিমুখে সতীশবাবু।

হেমন্ত বললে, "এই যে, আসুন! ব্যাপার কি সতীশবাবু? একমুখ হাসি যে?"

মিঃ দত্ত আগ্রহ-ভরে বললেন, "বিনোদের খোঁজ-টোজ পেয়েছেন বুঝি?"

—"না, পেয়েছি খালি এই জিনিষ-দুটো।" বলেই সতীশবাবু পকেট থেকে বার করলেন একজোড়া সাদা দস্তানা।

হেমন্ত দস্তানা-দুটো সতীশবাবুর হাত থেকে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বললে, "হুঁ। এর একটা দস্তানা আমি যে চিনি! রক্তের দাগ আর নেই বটে, কিন্তু কাঁচ দিয়ে কাটা অংশটা এখনো তেমনিই আছে!"

মিঃ দত্ত উত্তেজিত স্বরে বললেন, "তাই নাকি? কই দেখি—দেখি!"

—"এই নিন্।"

মিঃ দত্ত দস্তানা নেবার জন্যে দুটো হাতই ব্যগ্রভাবে বাড়িয়ে দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে হেমন্ত দস্তানা ফেলে নিজের দু-হাতে তাঁর হাত-দুখানা জোরে চেপে ধরলে এবং পর-মুহূর্তেই সতীশ-বাবু টপ্ ক'রে তাঁর জোড়া-হাতে পরিয়ে দিলেন হাতকড়ি।

বিস্ময়ে ক্রোধে অভিভূত হয়ে মিঃ দত্ত কয়েক মুহূর্ত একটাও কথা কইতে পারলেন না। তারপর চীৎকার করে বললেন, "হেমন্তবাবু, সতীশবাবু! এ-সব কি প্রহসন?"

হেমন্ত বললে, "প্রহসন নয় হরিহর, বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য!"

—"হরিহর! কে হরিহর?"

—"তুমি হরিও হ'তে পারো, হরও হ'তে পারো, দত্তও হ'তে পারো। কোন্‌টা তোমার আসল নাম কেউ জানে না।"

সতীশবাবু কঠোর স্বরে বললেন, "মি. দত্ত, মতিবাবুকে খুন আর আশী হাজার টাকা চুরির অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলুম।"

—"কোন্ প্রমাণে?"

হেমন্ত বললে, "দত্ত, প্রমাণ কি একটা আছে? আজও তুমি মতিবাবুর টানা থেকে মতিবাবুরই চাবি দিয়ে যে চল্লিশ হাজার টাকার হীরে-মুক্তো পান্না-চুনী চুরি করেছ, সে-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। সতীশবাবু, দত্তের জামা-কাপড় খুঁজে দেখুন তো!"

মিঃ দত্ত বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সতীশবাবু তাঁকে ধ'রে একবার ঝাঁকানি দিতেই তিনি ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। তাঁর পকেটের ভিতর থেকে সত্যসত্যই চোরাই মাল ও মতিবাবুর চাবির গোছা বেরিয়ে পড়ল।

হেমন্ত বললে, "দত্ত, এখন তুমি অপরাধ স্বীকার করবে?"

মিঃ দত্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

হেমন্ত বললে, "আচ্ছা, তবে আমার মুখ থেকেই তুমি নিজের কাহিনী শোনো। তোমাকে তো সেদিনও বলেছি দত্ত, এখনকার বৈজ্ঞানিক-পুলিসকে অপরাধীর স্বীকার-উক্তির উপরে নির্ভর করতে হয় না। তুমি পাথরের মত বোবা হয়ে থাকলেও ফাঁসিকাঠ তোমাকে ক্ষমা করবে না!"

দশম পরিচ্ছেদ

হেমন্তের কথা

সতীশবাবু, আমি সংক্ষেপেই সব বলব। যবনিকা পতনের সময় বেশী বাক্যব্যয় ভালো নয়।

বিনোদের উপরে আমার একবারও সন্দেহ হয় নি—সে মাতাল ও জুয়াড়ি জেনেও। প্রথমত, মদ খাওয়া, জুয়াখেলা আর খুন করা এককথা নয়। দ্বিতীয়ত, এটা ভালো ক'রেই জানা গিয়েছে যে, খুনের সময় সে বাড়ীতে ছিল না। সে যে সত্যসত্যই রাত বারোটা পর্য্যন্ত থিয়েটারে ছিল এবং তারপরে রাত প্রায় দেড়টা পর্য্যন্ত ছিল হোটেলে, এর প্রমাণ আমি নিজে গিয়েই সংগ্রহ করেছি। হোটেল থেকে সে ফিরে এসেছিল প্রচণ্ড মাতাল হয়ে। সে এমন বেহুঁস হয়েছিল যে, খেতে গিয়ে জামা-কাপড়ে ঢেলেছিল মাংসের ঝোল আর জামা-কাপড়ের নানা জায়গা পুড়িয়ে ফেলেছিল সিগারেটের আগুনে। এমন চৈতন্যহীন মত্ত অবস্থায় কেউ এ-ভাবে এত চালাকি খেলিয়ে চুপিচুপি খুন করতে পারে না। সতীশবাবু, কেবল এই একটিমাত্র কারণে বিনোদের উপরে সন্দেহ করা আপনাদের উচিত হয়নি। বেহুঁস মাতাল যে খুন করতে পারে

না, এ-কথা আমি বল্‌ছি না। আমার মনে হচ্ছে, খুব-বেশী মাতাল এত গোপনে খুন ক'রে স'রে পড়তে পারে না।

তবু যে সে পালিয়ে গেছে, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করতে চায়, কোনগতিকে এটা সে জানতে পেরেছিল, এবং পালাবার আগে সে যে কারেন্সি থেকে রাহাখরচের জন্যে নিজের কিছু টাকা ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, এটা আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারি।

আপনারা সন্দেহ করেছিলেন, হত্যাকারী হ'চ্ছে বাড়ীর লোক। কারণ বাড়ীর সব দরজা ছিল ভিতর থেকে বন্ধ। এবং কুকুরটা চেনা লোক দেখেই চ্যাঁচায় নি। কিন্তু কাদা-মাখা পদচিহ্ন ও অচেনা রবারের জুতোর অস্তিত্ব দেখেই আমি বুঝেছিলুম, খুনীরা এসেছে বৃষ্টির পরে, রাস্তা থেকেই। আমি মনে মনে খুনের রাতের ঘটনাগুলো সাজিয়েছিলুম এই ভাবে। (অবশ্য এটা জানবেন যে সমস্ত প্লটটা একদিনে একসঙ্গে হঠাৎ আমার মনের ভিতরে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে নি। কোন ঘটনা-সূত্র পেয়েছি আগে, আবার গোড়ার দিককার কোন সূত্র পেয়েছি শেষের দিকেই।)

ধরুন, রাম আর শ্যাম মতিবাবুকে খুন করবে। রাত সাড়ে-দশটার সময় মতিবাবুর বাড়ীতে ঢোকবার দরজা বন্ধ হয়, খুনীরা সে খবর রাখে। রাত ন'টার সময় বৃষ্টি থামল। রাম ও শ্যাম ঘটনাস্থলে প্রবেশ করলে। রামের সঙ্গে মতি-বাবুর চেনাশোনা ছিল। মতিবাবু তখনো শোবার ঘরের

দরজা বন্ধ করেন নি, পরিচিত লোক ব'লে রাম বিনা আহ্বানেই ভিতরে গিয়ে ঢোকে। কুকুরটাও রামকে বিলক্ষণ চিনত, তাই গোলমাল করেনি। আর রামের সঙ্গে গিয়েছিল ব'লে শ্যামকে দেখেও চ্যাঁচায় নি। শ্যাম নিশ্চয় দরজার বাইরে এক-আধ মিনিট অপেক্ষা করেছিল, কারণ তার জুতোর স্পষ্ট ছাপ আমরা পেয়েছি। চলন্ত লোকের পায়ের ছাপ আর দণ্ডায়মান লোকের পায়ের ছাপ একরকম হয় না, এটা সকলেই জানে। পরে রামের আহ্বানে শ্যামও তাকে সাহায্য করবার জন্যে ঘরের ভিতরে যায়। কাজ শেষ ক'রে দুজনেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। রাত সাড়ে-দশটার সময়ে দ্বারবান রাস্তার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দেয়। কাজেই বাইরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকা খুবই স্বাভাবিক।

রাম হচ্ছে মতিবাবুর বন্ধু, সে তাঁর সব অভ্যাসের কথা জানে। ডায়ারির ভিতরে মতিবাবুর কোন কোন গুপ্তকথা আছে এটাও হয়তো তার অজানা ছিল না। খুনের রাতে হয়তো কোন কারণে ভয় পেয়ে বা সময় অভাবে সে ডায়ারি পড়বার সুযোগ পায়নি। কিন্তু পরে যথাসময়ে কাজে লাগাতে পারবে বুঝে ডায়ারি আর চাবির গোছা নিয়ে পালায়। সে এ বাড়ীর বন্ধু, খুনের পরেও এখানে তার প্রবেশ বন্ধ হবার ভয় নেই। খুব সম্ভব, রাম হ্যাণ্ডনোটে মতিবাবুর কাছ থেকে বারে বারে টাকা ধার করেছিল, তাই যাবার সময়ে নির্ব্বিচারে সব হ্যাণ্ডনোটও সঙ্গে নিয়ে পালায়।

ঘটনাস্থলে এসে মতিবাবুর মৃতদেহ দেখে আমি অবাক্ হ'য়ে যাই। লাসের গলায় ঐ নীলদাগটা কিসের? আঙুলের চাপে ঠিক ও-রকম কালশিরা পড়ে না। তারপর লাসের পিঠের তলায় ঐ ভাঙা কাঁচের টুক্‌রো থাকার মানে কি? ধ্বস্তাধ্বস্তি হ'ল বিছানায়, কুঁজোর মুখ থেকে গেলাস কেন এখানে এল, কেনই বা ভাঙল, কেনই বা একজন খুনীর হাত কাটল?

আমার মন বললে, একজন খুনী গেলাসে কোন বিষাক্ত পদার্থ ঢেলে মতিবাবুর কাছে আসে। আর একজন তাঁকে চেপে ধরে। মতিবাবুকে গেলাসের বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা হয়—তিনি ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে বিছানা থেকে নেমে পড়েন এবং সেই মুহূর্তেই গেলাসের বিষ তাঁর গলায় ঢেলে দেওয়া হয়। সে বিষ এমন ভয়ানক যে মতিবাবু চ্যাঁচাবারও সময় পাননি—কিন্তু তাঁর ধ্বস্তাধ্বস্তির চোটে খুনীর হাতের গেলাস ভেঙে ও খুনীর হাত কেটে যায়। তারপর ভাঙা কাঁচের উপরে গিয়ে পড়ে মতিবাবুর দেহ। সব ব্যাপার ঘটে দু-এক সেকেণ্ডের মধ্যে।

বিষ যদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই মতিবাবুকে গলা টিপে মারা হয় নি। কিন্তু ডাক্তাররা শবদেহে বিষের কোন অস্তিত্ব পাননি। তবু আমার সন্দেহ গেল না। কারণ ঐ ভাঙা গেলাস! ওটা না থাকলে আমি ডাক্তারদের কথাই বিশ্বাস করতুম। কিন্তু গেলাস যখন পাওয়া গেছে, মতিবাবুকে নিশ্চয়ই কিছু খাওয়ানো হয়েছে। সেটা কি হ'তে পারে? হয়তো এমন কোন নতুন বিষ, ডাক্তাররা যার নাম জানেন না।

আপনারা কেউ লক্ষ্য করেননি, কিন্তু দত্তকে প্রথম দিন দেখেই আমি লক্ষ্য করেছিলুম, তার ডানহাতের একটা আঙুলের ওপরে 'ফ্লেস-কলারে'র 'প্ল্যাষ্টার' লাগানো আছে। গোয়েন্দার প্রথম কর্ত্তব্য,সকলকে সন্দেহ করা। খুনীর হাত বা আঙুল কেটেছে তার প্রমাণ রয়েছে, দত্তেরও আঙুল কাটা। দত্ত হচ্ছে মতিবাবুর বন্ধু। তার এ-বাড়ীতে অবাধ গতি। এবং সে হচ্ছে রাসায়নিক, তার পক্ষে কোন অজানা বিষের অস্তিত্ব জানা অসম্ভব নয়। এ সন্দেহগুলোও আমার মাথায় ঢুকেছিল। কিন্তু সন্দেহ মাত্র।

ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত ঐ দস্তানার রহস্য নিয়েও অনেক ভেবেছিলুম। কারণ ও-রকম পুরু পশমী দস্তানা কেউ হাতে পরে না, বিশেষ বাংলাদেশে। তবে প্রথমে কোনই সদুত্তর পাইনি।

পরে বুঝেছি ঐ দস্তানাটা ছিল হরিহরের—অর্থাৎ দত্তের সঙ্গীর হাতেই। সেইই দস্তানা-পরা-হাতে কাঁচের গেলাসটা ধরেছিল আর কাঁচের গেলাসটা তাকে দিয়েছিল দত্তই। সেই সময়েই গেলাসের গায়ে দত্তের আঙলের ছাপ পড়ে। কিংবা গেলাসটা ভাঙবার পর দত্ত তার উপরে হাত দিয়েছিল।

কিন্তু রক্তমাখা দস্তানাটা কেন আমি নিয়ে যেতে চাই, সেটা জানবার জন্যে দত্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তারপর সে চ'লে যায় ও পথে আমরা আক্রান্ত হই। পাহারাওয়ালার কাছ থেকেও ভাঙা গেলাসটা কেড়ে নেবার চেষ্টা হয়। আমার কাছে দস্তানা আর পাহারাওয়ালার কাছে ভাঙা গেলাস আছে, এ-কথা বাইরের লোকের মধ্যে কেবল দত্তই জানত। সেজন্যেও

তাকে আমি সন্দেহ করি। কিন্তু কেবল সন্দেহ ক'রে তো লাভ নেই, আগে দরকার প্রমাণ।

সতীশবাবু, আমি যে দু-একটি বিষয় প্রথমে আপনার কাছে লুকিয়েছিলুম, পরে আজই সকালে আপনার কাছে প্রকাশ করেছি। ঘটনাস্থলের কর্দ্দম চূর্ণ পরীক্ষা করবার পর তার মধ্যে আমি কাদার সঙ্গে পেয়েছিলুম চূণ, সুরকি, বালি ও কয়লার গুঁড়ো। যেদিন আমরা দত্তের বাড়ীতে চা খেতে যাই, সেদিন দেখলুম, সরু গলির মধ্যে তৈরি হচ্ছে একখানা নতুন বাড়ী। লক্ষ্য করলুম, তার পাশেই রয়েছে একটা কয়লার দোকান। গলির সেখানটায় মাটির সঙ্গে চূণ, বালি, সুরকি ও কয়লার গুঁড়ো ছড়ানো। তার দু-তিনখানা বাড়ীর পরেই দত্তের বাড়ী। সুতরাং এখানকার মাটি মাড়িয়ে তাকে রোজই আনাগোনা করতে হয়। বৃষ্টিতে পথে কাদা হ'লে এখানকার কাদার চাপ যে তার জুতোর গোড়ালি আর সোলের ফাঁকে লেগে থাকবে, এটা বেশ সহজেই বোঝা যায়। ঐ নতুন বাড়ী ও কয়লার দোকানই দত্তের প্রতি বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

দত্তের বাড়ী থেকে ফেরবার পথে আমি সকলের অগোচরে সেই নতুন বাড়ীর সামনের পথ থেকে এক মুঠো ধূলো তুলে নিয়ে গিয়েছিলুম। পরে পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলুম, আগেকার কর্দ্দম-চূর্ণ আর এই একমুঠো ধূলোর উপাদানে কোন প্রভেদই নেই। মতিবাবুকে যে খুন করেছে, ঐ নতুন বাড়ীর সামনেকার মাটি মাড়িয়েই তাকে যেতে হয়েছে।

তারপর দত্তের রসায়নাগার দেখে আমার সন্দেহ আরো বেড়ে উঠল। সেখানে আবিষ্কার করলুম, দ্রবীভূত বাতাস। আমিও রসায়ন-শাস্ত্র পড়েছি, রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, কিন্তু সেদিন দত্তের সামনে ন্যাকা সেজেছিলুম, তাঁর কাছ থেকে কথা আদায় করবার জন্যে।

ধাঁ ক'রে আমার মাথায় একটা ভীষণ সত্যের ইঙ্গিত জাগল। দ্রবীভূত বাতাসকেই দত্ত বিষের মত ব্যবহার করেছে। সতীশবাবু, আপনি হয়তো জানেন না, এই দ্রবীভূত বাতাসকে রাসায়নিকরা নানা নির্দ্দোষ কাজে লাগান বটে, কিন্তু এ-জিনিস মানুষের মুখের ভিতরে ঢেলে দিলে তখনি তার মৃত্যু হবে, অথচ মৃতদেহে তার কোন চিহ্নই পাওয়া যাবে না। কি মারাত্মক বুদ্ধি-চাতুরী। ভাগ্যে দ্রবীভূত বাতাস হচ্ছে অত্যন্ত দুর্ল্লভ জিনিষ—সাধারণ হত্যাকারীর নাগালের বাইরে। নইলে দ্রবীভূত বাতাস মানুষের সমাজে বিষম বিভীষিকা সৃষ্টি করতে পারত।

দ্রবীভূত বাতাস এমন ভয়ানক ঠাণ্ডা যে, পরীক্ষাগারে হাতে পুরু দস্তানা না পরলে কাঁচের পাত্রে তাকে নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব! এই জন্যেই হত্যাকারী হাতে দস্তানা প'রে কাঁচের গেলাসে দ্রবীভূত বাতাস ঢেলে মতিবাবুকে তা পান করতে বাধ্য করেছিল।

তারপর হরিহরের অস্তিত্ব আবিষ্কার। সতীশবাবু আমাকে যে ছবি দিয়েছিলেন তাতে হরিহরের মুখে দাড়ী-গোঁফ নেই,

কিন্তু দত্তের মুখে আছে গোঁফ আর ফ্রেঞ্চ-কাট্ দাড়ী। দত্তের বয়স এখন চল্লিশের ওপারে, তার মুখেরও কিছু-কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে বটে, কিন্তু হরিহরের মুখের সঙ্গে দত্তের মুখের কিছু-কিছু সাদৃশ্য আমি পেয়েছিলুম। আমি কিছু-কিছু ছবি আঁকতেও জানি। হরিহরের চোখ নাক ঠোঁট অনেকটা দত্তের মতই। তাই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে হরিহরের ছবির মুখে বসিয়ে দিলুম দত্তের মত গোঁফ আর ফ্রেঞ্চ-কাট্ দাড়ী! ফল হ'ল বিস্ময়কর! বুঝেছ রবীন, সতীশবাবু সেই ছবি দেখে সেখানাকে প্রথমে দত্তের ছবি ব'লেই ধ'রে নিয়েছিলেন! তারপর আমাদের জানতে বাকি রইল না, আমাদের দত্ত-মশাই—থুড়ি, মিঃ দত্ত —হচ্ছেন কোন্ দেশের বাজ-পাখী!

'লিক্উইড্ এয়ার' দিয়ে দত্ত তার পাপ-কাজের সঙ্গীকেও পাঠিয়ে দিয়েছে যমের বাড়ী। কি ক'রে তাকে মারা হয়েছে এখনো তা প্রকাশ পায়নি বটে, তবে হত্যাকারী যে দত্ত তাতে আর সন্দেহ নেই! দ্রবীভূত বাতাসের এমন ভয়াবহ ব্যবহার পৃথিবীর আর কোন অপরাধীই বোধহয় জানে না। দত্ত তাকে মেরেছে কেন? একজন সাক্ষী বা অংশীদার বা পথের কাঁটা সরাবার জন্যেই!

দত্ত জানত, আমি রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে অল্প-বিস্তর নাড়াচাড়া করি। তার ভয় হয়েছিল এ-রকম অসাধারণ দস্তানা দেখে আমার মনে দ্রবীভূত বাতাস সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত জাগা হয়তো অসম্ভব নয়। অপরাধীর মন কিনা! তাই উপর-চালাকি

করতে গিয়ে দস্তানা কেড়ে নিয়ে আমার হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হয় মতিবাবুর ডায়ারিখানা!

আর একটু বাকি আছে। দত্তকে হাতে-নাতে ধরবার জন্যে আজ আমি এখানে ফাঁদ পেতেছিলুম। খুনীর পকেট থেকে ডায়ারি হস্তগত ক'রেই আমি বুঝেছিলুম; খুনী যখন মতিবাবুর চাবি নিয়ে গেছে, তখন টেবিলের গুপ্তস্থান থেকে চল্লিশ হাজার টাকার হীরে-মুক্তো চুরি করার প্রথম সুযোগ সে কখনোই ছাড়বে না। দত্তের আবির্ভাবের আগেই আমি টেবিলের ডান-দিকের টানার ফাঁকে এমন ভাবে একটা আল্‌পিন ঢুকিয়ে রেখেছিলুম যে, কেউ টানা খুললেই আল্‌পিনটা স'রে প'ড়ে যাবে!

তারপর দত্ত এল। পাহারাওয়ালাকে শেখানো ছিল, সে একটা বাজে কথা ব'লে আমাদের বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। দত্ত রইল ঘরে একা। মিনিট-কয় পরে আমরা ফিরে এলুম। টেবিলের কাছে গিয়ে দেখি, টানার ফাঁকে আল্‌পিন নেই! তখনি বোঝা গেল, দত্ত সুযোগের অপব্যবহার করেনি!

এদিকে দত্ত যখন এখানে ব'সে আমার সঙ্গে কথা কইছে, সতীশবাবু তখন গিয়েছেন দত্তের রসায়নাগার ও বাড়ী খানা-তল্লাস করতে। তারই ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে দস্তানা-জোড়া! ঐ দস্তানাও এই মামলায় এক বড় সাক্ষীর কাজ করবে।

দত্ত, এখনো কি তুমি অপরাধ স্বীকার করবে না? দেখছ তো, তোমার প্রতি পদক্ষেপের হিসাব রয়েছে আমার কাছে!

অ।তিরিক্ত চালাকের মতন তুমি খুনের জন্যে এমন একটা দিন নির্ব্বাচন করেছিলে, যেদিন হয়েছিল মতিবাবুর সঙ্গে বিনোদের ঝগড়া। তারপরে আমাদের ভিতরের খবর জানবার আর বিনোদের উপরে দোষ চাপাবার জন্যে তুমি সেজেছিলে পুলিসের সাহায্যকারী বন্ধু! তুমি হ'চ্ছ গভীর জলের মাছ! অসাধারণ মস্তিষ্কচালনা করেছিলে বটে, কিন্তু পাপীর সমস্ত চাতুর্য্যই মিথ্যা। ভগবান ঘুমিয়ে থাকেন না।

এত সেয়ানা হয়েও দত্ত ধরা পড়ল প্রধান তিনটে কারণে। প্রথমত, সেই তুচ্ছ চুণ-বালি-সুরকি-কয়লার গুঁড়ো। দ্বিতীয়ত, ভাঙা কাঁচের উপরে তার আঙুলের ছাপ। তৃতীয়ত, উপর-চালাকি ক'রে সে যদি আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ না করত, তাহলে আমিও ঐ দ্রবীভূত বাতাসের অভাবিত ও বিস্ময়কর ব্যবহারটা আন্দাজে কল্পনা করতে পারতুম না। বলতে কি, দ্রবীভূত বাতাসের কথা একবারও আমি ভাবিনি। কিন্তু দত্তের রসায়নাগারে ঐ দুর্ল্লভ জিনিষটিকে দেখেই আমার মনের ভিতরে জেগেছিল একটা আশ্চর্য্য সন্দেহ!

সতীশবাবু, এখনো কি আপনি বিনোদকে গ্রেপ্তার করতে চান? কিন্তু আর সে আপনাকে ভয় করবে না, দুদিন পরেই আবার তার দেখা পাবেন। খবরের কাগজে হত্যাকারীর গ্রেপ্তারের বিবরণ বেরুলেই বিনোদ আর অজ্ঞাতবাস করতে রাজি হবে না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিনোদ এবারে ভালো ছেলে হবে।

সতীশবাবু, আর একটা কথা। য়ুরোপে এখন বিজ্ঞান-জানা খুনী, চোর বা অপরাধীর দল রীতিমত ভারি। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে, এদেশের অপরাধীরা এখনো পাপ-কাজে বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে শেখেনি। অবশ্য এটা সকলেই জানে যে, বিখ্যাত পাকুড় খুনের মামলায় প্রকাশ পেয়েছে, অপরাধীরা হত্যাকার্য্যে প্লেগের জীবাণু ব্যবহার ক'রে অভাবিত চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছে! কিন্তু এ-শ্রেণীর শিক্ষিত অপরাধী এখানে দুর্ল্লভ। নইলে এ-দেশী পুলিসকে সাত হাত জলের তলায় প'ড়ে অন্ধকার হাত্‌ড়ে হাবুডুবু খেতে হ'ত। তবু আমার মত হচ্ছে, এদেশেরও পুলিসের উচিত, বিজ্ঞান সম্বন্ধে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করা? কেননা অদূর-ভবিষ্যতে ভারতবর্ষেও বৈজ্ঞানিক-অপরাধীর দল ভারি হওয়ার সম্ভাবনা আছে যথেষ্টই।

এস রবীন, শ্রীমান দত্তের সামনে পরলোকের দরজা খুলে দিয়ে এখন আমরা সসম্মানে প্রস্থান করি। নমস্কার, সতীশবাবু! দত্ত, কিছু মনে কোরো না। তোমাকে আর নমস্কার করবার ইচ্ছা হচ্ছে না!

শেষ